ঋষি অরবিন্দের
বিপ্লব সাধনা
— পৃঃ ১৯

দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৫ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা।। ১৪ আগস্ট, ২০২৩
২৮ শ্রাবণ - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫
পনেরোই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা
website : www.eswastika.com

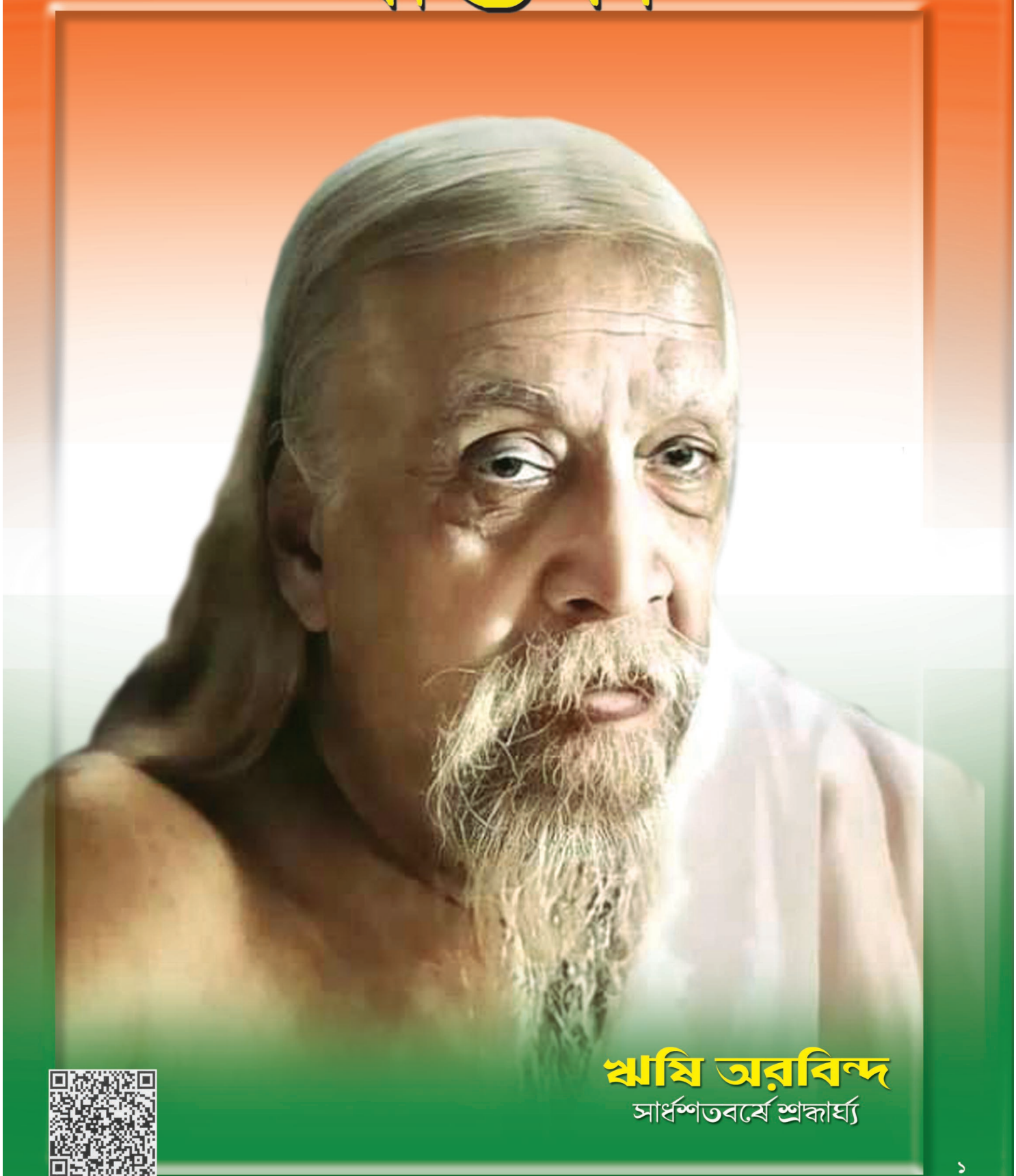

ঋষি অরবিন্দ

সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

পনেরোই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

৭৫ বর্ষ ৫০ সংখ্যা, ২৮ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১৪ আগস্ট - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

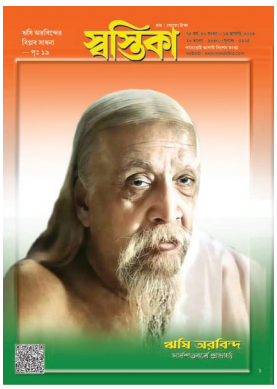

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে দুই পদক্ষেপ শিক্ষাব্যবস্থাকে পালটাতে পারবে কি? □ বিশ্বামিত্র □ ৬

পার্থ তো আপনার নাম বলে দিল! এটা খুব খারাপ হলো দিদি

□ সুন্দর মৌলিক □ ৭

তেল নয়, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এখন চালনির্ভর

□ সোমনাথ মুখার্জী □ ৮

জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক প্রকল্প নয় তা ঈশ্বরের ধর্মীয় আদেশ

□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ১০

শ্রীঅরবিন্দের ভারতবোধ □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ১৩

ঋষি অরবিন্দের বিপ্লব সাধনা

□ অধ্যাপক (ড.) স্বাগত বসু □ ১৯

আত্মিক মুক্তিমার্গের যাত্রায় প্রাণবন্ত আত্মা শ্রীঅরবিন্দ

□ অমিত ঘোষদস্তিদার □ ২৩

হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ আজও অব্যাহত

□ মন্দার গোস্বামী □ ২৫

শ্রাবণ মাসের মাহাত্ম্য □ কানু রঞ্জন দেবনাথ □ ৩১

অসমীয়া জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব

□ ড. পূর্ণেন্দুশেখর দাস □ ৩৩

দশাবতার তাস—খেলার মধ্যেও ভারতীয় সংস্কৃতি

□ মরুতৃষা সরকার □ ৩৪

স্বাধীনতা দিবসে কৃষ্ণ ষোলোকেও স্মরণে রাখতে হবে বাঙ্গালিকে

□ বিনয়ভূষণ দাশ □ ৩৫

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন সর্দার উধম সিংহ □ প্রণব দত্ত মজুমদার □ ৪৩

সশস্ত্র বিপ্লবের অবিচল সেনানী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু

□ রাজদীপ মিশ্র □ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ :

সমাবেশ সমাচার : ২৬-২৯ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ২১ আগস্ট, ২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ২১ আগস্ট, ২০২৩

রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত

রাজ্যপালকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের অশান্তি আর যাচ্ছে না। সি ভি আনন্দ বোস যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত হলেন তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। জগদীপ ধনকড়কে নিয়ে 'দুঃস্বপ্ন' বোধহয় কাটল। 'হাতেখড়ি' দিয়ে সি ভি আনন্দ মহাশয়কে বাগে আনার চেষ্টার কম ছিল না। কিন্তু যখনই রাজ্যপাল প্রশাসনের ভুল-ত্রুটিগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে শুরু করলেন, 'পিস রুম' থেকে উপাচার্য নিয়োগ, চাকরি বিক্রি থেকে ভোট-সন্ত্রাস নিয়ে কড়া ভাষায় সমালোচনা শুরু করলেন, তখনই শুরু হলো রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। সরকারের তরফ থেকে রাজ্যপাল সমান্তরাল প্রশাসন চালাচ্ছেন বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন হলো— রাজ্যপাল যা করছেন তা করতে পারেন কিনা। এইসব অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ বন্ধ করা তাঁর পক্ষে কি সম্ভব? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা হবে। লিখবেন— রাজলক্ষ্মী বসু, বিমল শঙ্কর নন্দ প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবস সংকল্প গ্রহণের দিন হউক

পনোরোই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। দিনটি ভারতবাসীর নিকট যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ দুই-ই বহন করিয়া আনে। আনন্দ এই জন্য যে দীর্ঘ পরাধীনতার অবসান ঘটিয়া ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। দেশের মাটিতে প্রাণ ভরিয়া শ্বাস লইবার অধিকার মিলিয়াছে। আর বিষাদের এই জন্য যে, ইহার মাত্র একদিন পূর্বে এই দেশের বিভাজন ঘটিয়াছে। দেশ মাতৃকার অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হাজার বৎসর যাবৎ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সেনানীরা দেশকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিয়া তাহার শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য সতত সংগ্রাম করিয়াছেন, প্রাণ বলিদান দিয়াছেন। কেহ কেহ স্বাধীনতা যুদ্ধে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিবারকেই আহুতি দিয়াছেন। ব্রিটিশ শাসনকালে এই যুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। তাহাতেও ভারতমাতার বীর সন্তানরা প্রাণ আহুতি দিয়াছেন। কেহ কেহ দ্বীপান্তরের সাজাও ভোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচন। ভারত সন্তানের নিকট দেশ শুধুমাত্র এক টুকরা জমি নহে, তাহা এক জীবন্ত সত্তা। তাহার মধ্যে সাধক ও বীর সন্তানরা মাতৃমূর্তির দর্শন পাইয়াছে। সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী দেবী দুর্গাজ্ঞানে পূজা করিয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতসন্তানরা দেশকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারতে দেশকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিবার বহু উল্লেখ রহিয়াছে। ব্রিটিশের কূটচালে, বিধর্মীশক্তির গুন্ডামির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তৎকালীন জাতীয় নেতৃবর্গ সেই দেশমাতৃকাকে খণ্ডিত করিয়াছে। প্রশ্ন উঠিতেই পারে, শত শত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী যাঁহারা দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য প্রাণ আহুতি দিয়াছেন, তাঁহারা কি খণ্ডিত স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন? তাঁহারা অখণ্ড ভারতের পূজারি ছিলেন। তৎকালীন নেতৃবৃন্দের ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির কারণে দেশমাতৃকা খণ্ডিত হইয়াছে। আর ইহার কারণেই স্বাধীনতাকামী ভারতসন্তানের একাংশ পুনরায় পরাধীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে। অদ্যাবধি তাহারা কলঙ্কময় জীবনযাপন করিতেছে। স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে ইহা বড়ো বেদনাময়, বড়ো বিষাদের।

পনেরোই আগস্ট জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মকে দেশবিভাগের করুণ ইতিহাসের কথা স্মরণ করাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। হাজার বৎসরের কালখণ্ডে স্বাধীনতার যুদ্ধে যাঁহারা প্রাণ বলিদান দিয়াছেন তাঁহাদের স্মরণ করিবার দিন। বৈদেশিক শাসকের হাত হইতে শাসনভার গ্রহণ করিয়া স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প লইবার দিন। পরাধীনতার সর্বপ্রকার মানসিকতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিবার দিন। মনে রাখিতে হইবে, মন ও মানসিকতায় অদ্যাবধি শত শত স্বজাতীয় বিদেশি শাসন ও প্রশাসনে আধিপত্য কায়েম রাখিয়াছে। তাহাদের হইতে সতর্ক থাকিতে হইবে। বিদেশি শাসক বিদায় লইয়াছে কিন্তু লড়াই এখনো বাকি রহিয়াছে। তাহা হইল স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই। নূতন ভারতে স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যম শুরু হইয়াছে, তাহাতে দাস মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের বিরোধিতাও শুরু হইয়াছে। তাহারা দেশে-বিদেশে দেশকে কালিমালিপ্ত করিবার নিরন্তর চেষ্টা করিতছে।

শত শত স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে সঙ্গে আর যাঁহাকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হইবে তিনি শ্রীঅরবিন্দ। তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধের এবং বিপ্লবী আন্দোলনের ঋত্বিক। তিনি মনে করিতেন স্বাধীনতা জাতির প্রাণবায়ু। তাহা ভিক্ষা করিয়া অর্জন করা যায় না। তিনি মনে করিতেন, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই স্বাধীনতা। জাতীয় নেতৃত্বের নিকট তাঁহার দাবি ছিল, স্বাধীনতা লাভের পর সত্যযুগের জাতীয় গৌরবকে পুনরুদ্ধার করিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেদান্তের আদর্শকে প্রচার করিতে হইবে। স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে তাঁহার সেই মহাবাক্যটি স্মরণ করিতে হইবে, দেশের এই বিভাজন সর্বপ্রকারে কৃত্রিম, তাহা দেবনির্দিষ্ট নহে। বিশ্বের কল্যাণের জন্যই ভারতকে পুনরায় অখণ্ড হইতে হইবে। স্বাধীনতা বিদস উদ্‌যাপনে তাঁহার সেই কথাটি সদাসর্বদা মনে রাখিতে হইবে । ঋষির মহাবাক্যটি রূপায়ণ করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রবাদী প্রতিটি ভারতবাসীর। তাঁহার আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষে তাঁহার প্রতি রহিল ভক্তিবিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সুভাষিতম্

আয়ুষঃ খণ্ডমাদায় রবিরস্তময়ং গতঃ।
অহন্যহনি বোদ্ধব্যং কিমেতৎ সকৃতং কৃতম্।।

সূর্য অস্ত গেলেই নিজের আয়ু একদিন কম হয়ে যায়, এটা জেনে প্রত্যেককে প্রতিদিন নিজের কাজের বিচার করা উচিত।

রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে দুই পদক্ষেপ শিক্ষাব্যবস্থাকে পালটাতে পারবে কি?

বর্তমানে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে বেহাল দশার কথা সকলেরই জানা। একদিকে আর্থিক দুর্নীতির দায়ে শিক্ষাদপ্তরের একাধিক কর্তাব্যক্তি দুর্নীতির দায়ে জেলে আছেন, অন্যদিকে বিভিন্ন শিক্ষা-সংক্রান্ত ঘটনায় হাইকোর্টের তোপের মুখে পড়ছে রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে উচ্চশিক্ষায় একদিকে রাজ্যের শাসক দল যেমন সরকারি হস্তক্ষেপ বাড়ালো, অন্যদিকে হাইকোর্টের গুঁতোয় স্কুলশিক্ষায় জনমোহিনী নীতি নিল। আর এই দুই কাজই করতে সাংবিধানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হলো।

গত ৪ আগস্ট রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন (সংশোধনী) বিল। রাজ্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ এবং সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করা লক্ষ্যেই এই বিল আনা হয়েছে। ভোটাভুটিতে অংশ নেওয়ার পরে স্লোগান দিতে দিতে বিরোধীরা বিধানসভা কক্ষ ছেড়েও চলে যান। তবু এই বিল আটকানো যায়নি। পরে এই বিলের প্রতিবাদে বিজেপি বিধায়করা রাজভবন অভিযান করে রাজ্যপালকে এই ব্যাপারে স্মারকলিপি দেন। বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা মনোজ টিগ্গার নেতৃত্বে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি বিধায়করা। সেখানে বিলটিতে অনুমোদন না দেওয়ার জন্য রাজ্যপালকে অনুরোধ করেন তাঁরা। রাজভবন থেকে বেরিয়ে মনোজ টিগ্গা জানান, রাজ্যপাল জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে যা করার তিনি করবেন।

সরকার সূত্রের দাবি, রাজ্যের ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য বাছাইয়ে সার্চ কমিটি গঠন সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্তনের জন্যই বিধানসভায় এই বিল এসেছে। বিরোধীদের প্রধান আপত্তি কমিটিতে মুখ্যমন্ত্রীর মনোনীত প্রতিনিধি রাখা নিয়ে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বিধি মেনেই এই সংশোধনী আনা হয়েছে। সার্চ কমিটিতে রাজ্যপাল এবং ইউজিসির প্রতিনিধি যেমন থাকবেন, তেমনি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধিও থাকবেন।

অন্যদিকে তিনি ফের মুখ্যমন্ত্রীকেই আচার্য করার দাবি জানিয়ে বলেন, রাজ্যপালকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে রাখার বিষয়টি আসলে ঔপনিবেশিক মানসিকতার প্রতিফলন। বিরোধীরা বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবি করেন। কিন্তু সেই দাবি নস্যাৎ করে বিলটি ১২০-৫১ ভোটে বিধানসভায় পাশ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, কলকাতা-সহ রাজ্যের ৩১ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য বাছাইয়ে সার্চ কমিটি গঠনের ব্যাপারে আগেই অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছিল। সেই অর্ডিন্যান্সকে আইনি স্বীকৃতি দিতে রাজ্য বিধানসভায় এই বিল আনা হয়। বিলে বলা হয়েছে, কোনও উপাচার্যের ৬৫ বছর পূরণ হওয়ার পর নতুন উপাচার্য নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত, তিনিই পরবর্তী উপাচার্য হিসেবে এক বছর কাজ চালাতে পারবেন। বর্তমান আইনে ছ'মাস পর্যন্ত তাঁকে কাজ করার সুযোগ দেওয়া রয়েছে। বিলে আরও বলা হয়েছে, সার্চ কমিটি গঠন করতে হবে পাঁচ সদস্যকে নিয়ে। আগে সার্চ কমিটিতে তিনজন সদস্য ছিল। নয়া বিলে আরও বলা হয়েছে, সার্চ কমিটি উপাচার্য পদে তিন থেকে পাঁচ জনের নাম সুপারিশ করতে পারবেন।

বিরোধীদের অভিযোগ, বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার খর্ব করা হয়েছে। রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ মদত পেয়েছে। কারণ সার্চ কমিটিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিলটি শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হবে কি না তা নিয়ে প্রথম থেকেই সংশয় আছে, নির্ভর করছে রাজ্যপালের ওপর। অন্যদিকে বেসরকারি স্কুলের বেলাগাম ফি কাঠামো নিয়ে কদিন আগে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে অভিযোগও জমা পড়েছিল বিস্তর। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার শেষমেশ স্বাস্থ্য কমিশনের ধাঁচে শিক্ষা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিল। গত ৭ আগস্ট রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর জানা গিয়েছে, ওই বৈঠকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর এ-সংক্রান্ত প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষা কমিশনের কাজ কী হবে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত খসড়া প্রস্তুত করেছিল শিক্ষা দপ্তর। সেই সব প্রস্তাবেই সায় দেওয়া হয়েছে মন্ত্রীসভার বৈঠকে। তার মধ্যে মুখ্য বিষয় হলো, বেসরকারি স্কুলের ফি বা বেতন কাঠামো। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে পাওয়া খবরানুযায়ী, প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশন বেসরকারি স্কুলগুলির ফি কাঠামো নির্ধারণ করে দেবে। তারপর সে ব্যাপারে সুপারিশ করবে রাজ্য সরকারকে। কোনও বেসরকারি স্কুল অযৌক্তিক ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ফি আদায় করলে সে ব্যাপারে অভিযোগের শুনানিও হবে কমিশনে। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে সরকারের তরফে কী কী পদক্ষেপ করা যেতে পারে সে ব্যাপারেও কমিশন সময়ান্তরে সুপারিশ জানাবে। সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে বেসরকারি স্কুলগুলির একাংশের উষ্মা তৈরি হয়েছে। তাছাড়া অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, অথনীতির সূত্র অনুযায়ী, বেসরকারি ক্ষেত্রে দর দাম, ফি ইত্যাদি কী হবে তা বাজারের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। অবশ্য এর পালটা যুক্তিও রয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের অনেকেই মনে করেন, স্কুলের ফি-র নামে এক শ্রেণীর বেসরকারি স্কুল মুনাফাভোগী হয়ে উঠছে। তারা সরকারের থেকে নানা সুবিধা নিচ্ছে, অথচ সাধারণ মানুষের কাছে সেই সুবিধা প্রসারিত করছে না। এর বিহিত করা দরকার।

স্কুলের ফি-র নামে এক শ্রেণীর বেসরকারি স্কুল মুনাফাভোগী হয়ে উঠছে। তারা সরকারের থেকে নানা সুবিধা নিচ্ছে, অথচ সাধারণ মানুষের কাছে সেই সুবিধা প্রসারিত করছে না।

(অনিবার্য কারণবশত: রাজ্যপাট প্রকাশ করা সম্ভব হলো না)

পার্থ তো আপনার নাম বলে দিল !

এটা খুব খারাপ হলো দিদি

নিয়োগকর্তাযু দিদি,
'সকলই তোমারই ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা
লোকে বলে করি আমি'।

শ্যামাসংগীত গাইলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এটা হওয়ারই ছিল দিদি। আমি আগেই বলেছিলাম, দুধ কলা দিয়ে সব সাপ পুষছেন আপনি। আমি বলে রাখছি দিদি, জেলে যাঁরা রয়েছে, বাইরে যাঁরা রয়েছে সবাই কিন্তু একদিন আপনার নাম বলে দেবে। আসলে একটা কথা সবাই জানে 'নিজে বাঁচলে দিদির নাম'। এই যে কুণাল, এখন রোজ এত প্রশস্তি করে, ও কিন্তু আসলে ভাইপোর লোক। আমি বলে দিচ্ছি, আপনি মিলিয়ে নেবেন। জানি, আপনিও সেটা বোঝেন। তাই তো এবার অনেক চেষ্টা করলেও আপনি আর রাজ্যসভায় পাঠাননি। কিন্তু দিদি, ও যে একটা সময়ে রোজ রোজ বলত, আপনিই সারদা-সহ রাজ্যের সব বেআইনি চিটফান্ডের প্রধান ও মূল সুবিধাভোগী, সেই বক্তব্য কিন্তু এখনও তুলে নেয়নি। এখনও এ নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। কোথাও কিন্তু কুণাল বলেনি যে, সেই কথাগুলো ভুল ছিল।

পার্থের কথা বলতে গিয়ে কুণালে চলে গিয়েছিলাম। সরি! আসলে সবাই তো এক একটা বিশ্বাসঘাতক। এই পার্থকে আপনি কী করেননি বলুন তো। মন্ত্রী করেছেন। ভালো ভালো দপ্তর দিয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রেম করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এক নয়, একাধিক। সম্পত্তি বাড়াতে দিয়েছেন। স্ত্রীর নামে বেআইনি টাকায় স্কুল বানাতে দিয়েছেন। দলের মহাসচিব করেছেন। যে পদ রাষ্ট্রসঙ্ঘ ছাড়া ভূ-ভারতে আর কোথাও নেই।

গ্রেপ্তার হওয়ার পরে বান্ধবীর বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা, গয়না, সম্পত্তির দলিল উদ্ধারের পরেও তিনি বলে চলেছেন আমি নির্দোষ। সেটা অবশ্য প্রকাশ্যে। শোনা যায়, বাইরে এটা বললেও ভিতরে বলেন, 'যা করেছি সব দলনেত্রীর নির্দেশে।' কিন্তু তা বলে এমন প্রকাশ্যে সবটা বলে দেবে, নিয়োগ দুর্নীতিতে তাঁর কোনও 'ভূমিকা' নেই তো বলেনই। কিন্তু সেদিন আলিপুরের নগর দায়রা আদালতের শুনানিতে সেই দাবির সঙ্গে এটাও জানিয়েছেন যে, জড়িত গোটা প্রশাসন। এমনকী আপনার দপ্তরও। নিজের দাবির সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে ব্যাখ্যা দেন, কীভাবে কাজ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সেই ব্যাখ্যায় তিনি জড়িয়ে নিলেন আপনার নাম। পার্থ যে এসএসসি-তে নিয়োগ কর্তা বা সুপারিশ কর্তা ছিলেন না, সে কথা তিনি আদালত চত্বরে একাধিক বার বলেছেন। তবে এই প্রথম তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জড়িয়ে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানে আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যদিও আদালত থেকে বেরোনোর সময় পার্থ আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে জানান যে, মুখ্যমন্ত্রী কখনওই 'নিয়োগকর্তা বা সুপারিশকর্তা' নন তবে তার আগে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। আপনার প্রতি তাঁর 'আনুগত্য এখনও অপরিসীম' বলেও দাবি করেন পার্থ। প্রকাশ্যে সেটা সুন্দরবনের বাঘ থেকে কুমির সকলেই তো বলে। তাই বলে কি সবটা ঠিক?

এসএসসি-র কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করার সময় পার্থর আইনজীবীর বক্তব্যেই ওঠে মুখ্যমন্ত্রীর প্রসঙ্গ। কিন্তু দিদি পার্থ তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে কেন এই প্রসঙ্গ আদালতে তুললেন?

আদালতের কাছে পার্থের দাবি ছিল, গত এক বছরে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি সিবিআই। এই দুর্নীতিকাণ্ডে তাঁর কোনও 'ভূমিকা' নেই। এই দাবির সপক্ষেই পার্থ আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে কাজ করে এসএসসি। আদালতে তিনি জানিয়েছেন, এসএসসি আইনে ১৯৯৭ সালের পর থেকে একাধিক সংশোধন হয়েছে, যা শিক্ষা দপ্তর করেনি। সরকার করেছে। পার্থের দাবি, এসএসসির দুটি বিষয় রয়েছে। (১) নীতি প্রণয়ন। (২) কীভাবে কাজ করে এই সংস্থা। আদালতে তিনি দাবি করেন, এসএসসি নিজস্ব নীতিতেই চলে। সেখানে মন্ত্রীদের কোনও ভূমিকা নেই। পার্থ নিয়োগকর্তা কিংবা সুপারিশকর্তা ছিলেন না বলেও দাবি করেন। নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি নির্দিষ্ট দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে রিপোর্ট দেন। তাঁরা মুখ্য সচিবকে রিপোর্ট করেন। এরপর মুখ্যসচিব রিপোর্ট দেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

এই খবর ছড়িয়ে পড়ে পার্থ আদালতে থাকতে থাকতেই। তখনই মনে হয় আপনার 'ধমক' পৌঁছে গিয়েছিল। কেউ কেউ বলছে, হুঁশিয়ারি। আর তার পরেই আদালত থেকে বেরিয়ে পার্থ বলেন, 'দোহাই! আপনারা বিকৃতভাবে কখনও সংবাদ পরিবেশন করবেন না। মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগকর্তা নন। সুপারিশ কর্তাও নন। ইংরেজিতে আমি 'পলিসি মেকিং' বলেছি। যাঁরা বোঝেন ইংরেজি, তাঁরা বুঝেছেন।' সেই সঙ্গেই দাবি করেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্য আমার অপরিসীম ছিল। রয়েছে। আগামীদিনেও থাকবে।'

আমি কিন্তু সিঁদুরে মেঘ দেখছি। সোনা বউমা মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন। ভাইপো নিউ ইয়র্কের টাইম স্কোয়ারে ছবি তুলছেন। আর খবরের কাগজে কী সব রঙ্গ বান্ধবী, তাইল্যান্ডের বান্ধবী, তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গাদাগাদা টাকার কথা লিখছে। শুনছি, ইডি সব নিয়ে বসে আছে। ভাবছি, ঈশ্বর না করুন, একদিন প্রাণাধিক ভাইপো যদি এমনটা বলে বসে! □

অতিথি কলম

সোমনাথ মুখার্জী

তেল নয় আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এখন চাল নির্ভর

মানুষের প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য দীর্ঘদিনের রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাধারী। ভারত এর ব্যবহার নতুন হলেও সফলভাবে আয়ত্ত করেছে।

অতি সম্প্রতি ভারত সরকার চাল রপ্তানি বন্ধ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সঠিক। রাশিয়া ইউক্রেনের বন্দরগুলিতে আক্রমণ জারি রেখেছে। সেখানে রপ্তানি নিরাপদ নয়। খাদ্যবস্তু যে কৌশলী সিদ্ধান্তের বড়ো অস্ত্র আমেরিকা তা বারবার প্রমাণ করেছে। ইউক্রেনের ইজমাইল বন্দর যা দানিয়ুব নদীর ওপর সেখানে রাশিয়ার উপর্যুপরি আক্রমণ সারা বিশ্বের খাদ্য বাজারেই অস্থিরতা তৈরি করেছে। রাশিয়া ইউক্রেনকে বিশ্ব বাজারে কৃষ্ণসাগর রুটে চাল রপ্তানির যে অনুমতি দিয়ে রেখেছিল সম্প্রতি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তা বাতিল করেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ভারতেও বিভিন্ন প্রজাতির চাল বিশ্বের বহু দেশে রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে খাদ্যশস্যের ওপর ক্রেতা বা বিক্রেতা যেভাবেই হোক না কেন ভারতের ভূমিকার ব্যাপক প্রভাব আছে। কেননা ভারত এক বড়ো মাপের উৎপাদক এবং একই সঙ্গে উপভোক্তা। আজকের তারিখে ভারত বিশ্বে ৪০ শতাংশ চাল রপ্তানিকারক দেশ। আমদানি-রপ্তানি ক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তন এই প্রথম নয়। দেশের অভ্যন্তরে মূল্যমান ঠিক রাখতে ভারত প্রায়শই আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করে। গত বছরের মে মাসে গম রপ্তানি বন্ধ করা হয়েছিল রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের ফলে যখন বিশ্বব্যাপী গমের দাম আকাশ ছোঁয়া। কোনো ক্ষমতাসীন সরকারই আসন্ন নির্বাচনের সময় জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকার খারাপ প্রতিফলন ভোটে দেখতে চায় না। বিশেষ করে যদি তা নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্তু হয়।

২০০৭-০৮ সালে আমাদের এখানে জ্বালানি তেলের দামের অত্যধিক বৃদ্ধি (বহু খাদ্যবস্তু চাষিকে ইথানল উৎপাদনের দিকে ঠেলেছিল) কয়েক জায়গায় খরা ও সারের দামের ব্যাপক বৃদ্ধি খাদ্যবস্তুর নামে তীব্র বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি আটকাতে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া উভয়েই চাল রপ্তানির ওপর নানা বিধিনিষেধ জারি করে। ভারতে ২০০৯ সালে ক্ষমতাসীন দরকার পুনর্নির্বাচিত হয়। বোঝা যায় খাদ্যবস্তুর দামের সঙ্গে অর্থাৎ এটির কম থাকার সঙ্গে নির্বাচনী জয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অবাক হওয়ার কিছু নেই রপ্তানিতে কাটছাঁট করে কেন্দ্র সরকার সম্প্রতি ধনী চাষিদের অপ্রিয় করে তোলার ঝুঁকি নিয়েছে। তাদের চড়া দামের রপ্তানির লাভ পিঁপড়ে খেয়ে যাবে। এর মূল কারণ বড়ো মাপের চাষ আবাদে যুক্ত থাকা সম্প্রদায়ের সংখ্যা। বড়ো চাষি যাদের রপ্তানি করার মতো পর্যাপ্ত পণ্য রয়েছে তারা সরকারের কাছে এমএসপি ন্যূনতম ক্রয় মূল্যে বিক্রি করতে আগ্রহী নয়। এই তুলনায় ছোটো চাষি যাদের উৎপাদন কম সংখ্যা, প্রচুর বাঁচার জন্য দরকার হয়তো আরও কিছুটা বেশি তারা এই এমএসপি দ্বারা উপকৃত হয়। বিশেষ করে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় মূল্য কম। সেই জন্য অর্থশালী চাষিরা আন্তর্জাতিক বাজারে চড়া দাম থাকলে রপ্তানি বন্ধ হলে রেগে যায়। কিন্তু সেখানে দাম পড়ে গেলে সরকারের এমএসপি ভোগ করতে ছাড়ে না। এটা গাছেরও খাব তলার কুড়বো নয় কি?

যাইহোক, এই মুহূর্তে কেবল অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতির প্রসঙ্গ নয়। সরকার খাদ্যপণ্যের ব্যবসাটিকে এই পরিস্থিতিতে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের গম রপ্তানি বন্ধ করার পেছনে একটি তৈরি করা কৌশল ছিল। যে সময় নিজের পূর্ণ ক্ষমতায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হিসেবে ‘ প্রতিবেশী রাষ্ট্র-সহ অন্যান্য দুর্বল দেশগুলির দাবি ও প্রয়োজনসমূহের প্রতি সমর্থন’ এটি শুধুমাত্র আমলাতান্ত্রিক ঘরানার বাণী ছিল না। ভারত প্রয়োজনভিত্তিক ভাবে দেশগুলিকে সে সময় ২০২১ সালের রপ্তানি অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ গম রপ্তানি করেছিল। গত বছর ভারতের গমের সর্বাপেক্ষা গ্রহীতা ছিল ইজিপ্ট যারা বরাবর তাদের গম আমদানির ৮০ শতাংশ রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে করে থাকে। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধ তাদের ভিন্ন রাস্তা বাছতে বাধ্য করে। ভারত তার রপ্তানি দেশের তালিকায় বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বের দেশ হিসেবে আফ্রিকার এই দেশটিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এটি অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যেখানে রপ্তানি উপযুক্ত দেশের তালিকা প্রস্তুত হয়। হ্যাঁ, এই উদারতা অবশ্যই গোটা মিশরে ভারতের ছবি উজ্জ্বল করে তুলল। সেখানকার জনতার আলোচনায় এল অতীত অনেক দ্বিপাক্ষিক আলোচনার কক্ষ। সব চেয়ে চমকপ্রদ হলো মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদেল এলসিসি-র প্রধান অতিথি হিসেবে এবারের গণতন্ত্র দিবসে হাজির থাকা। এর ছ’ মাসের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী মোদী ফিরতি সফর করলেন ইজিপ্টে। এখানে চাল রপ্তানির সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া শেষ হলো না। ইজিপ্ট ভারতে তৈরি নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও তার পরিচালনা পদ্ধতির ওপর আগ্রহ দেখাল। এর মধ্যে ছিল আকাশ এসএএম, ব্রাহ্মোস কুইজ মিসাইল, এলসিএ তেজাস যুদ্ধ উড়োজাহাজ ও

একই সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সামরিক সহযোগিতা।

বোঝা যাচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যবস্তুকে নিয়ে ভারতের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থ! এর উলটো দিকে রপ্তানি করার জায়গায় রপ্তানি নিষিদ্ধ করার দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। রপ্তানি বন্ধ করা সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণ চাল বিশ্বের কয়েকটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি জারি রেখে দেশের অভ্যন্তরীণ দামের সঙ্গে হিসেব নিকেশ ঠিক রাখা চলছে। এই সংক্রান্ত অতীত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যবস্তুকে কেন্দ্র করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টা নতুন নয়।

সকলেই জানেন জ্বালানি তেল বিশ্ব রাজনীতির বাজার নিয়ন্ত্রণে থাকে ভূরাজনৈতিক অবস্থান বলে নির্ধারণে কেমন ভূমিকা নিত। ওপিইসি বা ওপেক নামক পেট্রোল রপ্তানিকারক দেশগুলির সংস্থা বহুবার আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিকে তেল রপ্তানি বন্ধ করে ইজরায়েলকে ওই দেশগুলির সমর্থনের বদলা নিয়েছে। বরাবরই তেলের উৎপাদন থেকে তেলের সংরক্ষণ ও সরবরাহ পথ নির্ধারণ করা এই ওপিইসি-এর হাতেই রয়েছে। আর এর মাধ্যমে আয়তনে ছোটো দেশগুলির ভূরাজনৈতিক অবস্থা কবজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছে। মনে পড়বে আমেরিকার খাদ্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টিতে পিএল ৪৮০-র কথা। রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার অতীতে তৎকালীন উন্নতিশীল গরিব দেশগুলিকে বাগে রাখতে মার্কিনি উদবৃত্ত গম রপ্তানি করে তাদের সমর্থন নিশ্চিত করে রাখত। বিশেষ করে যাতে তারা কমিউনিস্ট পক্ষে না চলে যায়। ভারত এই তালিকায় ছিল। পরবর্তীকালে পিএল ৪৮০-এর মাল এলে তবেই ভারতীয় রেশনে পাওয়া যাবে এমন নিষ্ঠুর অবস্থান নেওয়া হয়। যাতে সে সময়ের ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভারত আমেরিকার পাশে থাকে। সংক্ষেপে বললে মানুষের প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য দীর্ঘদিনের রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাধারী। ভারত এর ব্যবহার নতুন হলেও সফলভাবে আয়ত্ত করেছে। একটি স্থির লক্ষ্যের রপ্তানি পরিকল্পনা যা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের সম্পর্ককে উন্নত করতে পারে সেটা মাথায় রাখতে হবে। মহাকূটনীতিক চাণক্যের তাতে খুশি হওয়ার কারণও সৃষ্টি হবে।

(লেখক CIO, ASK wealth Advisor -এর ম্যানেজিং পার্টনার)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, গত জন্মাষ্টমী '২২ থেকে স্বস্তিকার ৭৫ বছর পালনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অবসরে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। যেমন— রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কু সী সুদর্শন, মোহনরাও ভাগবত, দত্তোপন্ত ঠেংড়ী, এইচ ভি শেষাদ্রি, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, সীতানাথ গোস্বামী, অসীম কুমার মিত্র, ভবেন্দু ভট্টাচার্য, কালিদাস বসু, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, পবিত্র কুমার ঘোষ, রমানাথ রায়, অমলেশ মিশ্র, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস, জিষ্ণু বসু, শিবপ্রসাদ রায়, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, দীনেশ সিংহ, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ হবে গ্রন্থটি। এটি আগামী অক্টোবর '২৩-এ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা (অর্থাৎ ১৫ আগস্ট, ২০২৩ -এর মধ্যে যাঁরা সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে কপি বুক করবেন তাদের জন্য)।

অনলাইনে টাকা পাঠালে নীচের দেওয়া ফোন নম্বরে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। জেলা অনুসারে তালিকা-সহ টাকা জমা করতে পারেন।

যোগাযোগ—

শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১

শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭

অনলাইনে টাকা পাঠানোর Bank Details—

Name - Swastik Prakashan Trust
Bank - Punjab National Bank
Branch- Vivekanand Road, Kolkata-700006
A/c. No. - 0954000100121397
IFS Code - PUNB0095400

বিঃ দ্রঃ— নগদ টাকা স্বস্তিকা দপ্তরেই জমা দিতে হবে।
চেক দিলে Swastik Prakashan Trust—এই নামে চেক কাটতে হবে।

জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক প্রকল্প নয় তা ঈশ্বরের ধর্মীয় আদেশ

সনাতন ধর্মই ভারতের জাতীয়তাবাদ আর জাতীয়তাবোধ। কারণ ভারতের সে জাতীয়তাবাদ 'ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা প্রায় অলঙ্ঘনীয় এক রাষ্ট্র নির্দেশ'। প্রয়োজনে সব প্রাণের বলিদান দিয়েও তাকে রক্ষা করাই ভারতবাসীর প্রধান কর্তব্য। এটাই শ্রীঅরবিন্দের 'সেকালের-একালের' জাতীয়তাবাদী ভাবনা।

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ঋষি অরবিন্দ বা শ্রীঅরবিন্দের চিন্তার অনন্য দিক— তাঁর কোনো উত্তরাধিকার নেই। তিনি কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাননি। কাউকে কোনো মাতব্বরি করার ইজারা বা ঠিকাদারি দিয়ে যাননি। তিনি স্বাধীন চিন্তাবিদ। পরিবর্তন আর খোলা ভাবনাই ভারতের এই ঋষির চিন্তার আকর। তাঁকে সাধুবাদ আর প্রণাম জানিয়ে আমার এই লেখা।

তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে ১৯০৮ সালের ১৯ জানুয়ারি মুম্বইতে জাতীয়তাবাদী সম্মেলনে বক্তৃতা করেছিলেন ঋষি অরবিন্দ। আনুমানিক পাঁচ হাজার মানুষ তাতে উপস্থিত ছিলেন। তার আগেই লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের বাড়িতে একটি ছোটো অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন শ্রীঅরবিন্দ। মুম্বইয়ের সভায় বলেছিলেন, 'এই মুহূর্তে ভারত জুড়ে একটি নতুন ধর্ম বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। নাম জাতীয়তাবাদ। বাঙ্গলা থেকে এই নতুন ধর্ম ভারতের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। যাঁরা তা মেনে নিয়েছেন তাঁরা নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলছেন। কিন্তু আপনারা কি বুঝেছেন জাতীয়তাবাদ কাকে বলে?

কেবলমাত্র উচ্চ মেধার গৌরব দেখিয়ে কি আপনারা জাতীয়তাবাদের দায়িত্ব নিজের হাতে নিচ্ছেন? নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলছেন? কিন্তু জাতীয়তাবাদ কাকে বলে তাকি আপনারা জানেন বা অনুধাবন করতে পেরেছেন? জাতীয়তাবাদ কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। জাতীয়তাবাদ হলো সেই ধর্ম যা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। জাতীয়তাবাদ কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। জাতীয়তাবাদ সেই ধর্ম যা নিয়ে আপনাকে বাঁচতে হবে। যে বা যিনি কেবলমাত্র উচ্চ মেধার গৌরব (পড়ুন মিথ্যা গৌরব) দেখিয়ে, বাড়তি স্বদেশিয়ানা আর দেশভক্তি দেখিয়ে নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদা আর উচ্চ মনে করেন তিনি কোনোভাবেই যেন নিজেকে জাতীয়তাবাদী মনে না করেন। জাতীয়তাবাদী হতে গেলে এই নতুন জাতীয়তাবাদী ধর্মকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। ধর্মীয় ভাব হিসেবে মেনে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, একজন জাতীয়তাবাদী হলেন ভগবানের যন্ত্র। ঈশ্বর তাঁকে ব্যবহার করছেন দেশের মুক্তি আর স্বাধীনতার জন্য।'

তাঁর কথায় বাঙ্গলার মানুষের কাছে জাতীয়তাবাদী সেই ধর্ম এসেছে। ভারতে তা ছড়িয়ে পড়বে। তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তা সফল হবে না। কারণ জাতীয়তাবাদ কোনো মানুষ নয়। ভগবান তার শক্তি। তাই জাতীয়তাবাদ অমর আর অবিনশ্বর। শ্রীঅরবিন্দের বলে যাওয়া কথা আজও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। যদিও ঐতিহাসিক আর রাজনৈতিক পট অনেকটাই পালটে গিয়েছে। তাই এ যুগের ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা শ্রীঅরবিন্দের ওই ধারণাকে বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু কোনোভাবেই তার ঐতিহাসিক মূল্যকে ছোটো করেন না। ঠিক

সেখানেই আমার শ্রীঅরবিন্দকে আজও অতি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। ইদানীং জাতীয়তা-বাদ ঘিরে অনেক ধরনের অহেতুক পণ্ডিতি চলছে। লোক দেখানো ওই সব চকমকি পণ্ডিতিতে আমার কোনো আগ্রহ নেই।

প্রধানভাবে এই দেশ যখন তার ৭৫ বছরের পাওয়া স্বাধীনতা উদ্‌যাপন করছে। পৃথিবী জুড়ে যত জাতীয়তাবাদী ঠিক তত জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা আর ব্যাখ্যা। অনেকটা ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদের শত্রু হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে আন্তর্জাতিকতাবাদ। সবসময় একটা ধারণা তৈরির চেষ্টা চলেছে জাতীয়তাবোধ হলো আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী। জাতীয়তাবাদ অপেক্ষা আন্তর্জাতিকতা অনেক বলিষ্ঠ আর গ্রহণযোগ্য এক দলিল আর দর্শন। ভারতের কিছু জিহাদি রাজনৈতিক দল সাধারণভাবে এই আওয়াজটা তুলে থাকে। যদিও তারা জানে যে গাছে না উঠে কলার কাঁদি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ টপকে আন্তর্জাতিকতা আসতে পারে না। আর ঠিক তাই জাতীয়তাবাদ বিরোধী রাজনীতি করতে গিয়ে তারা আন্তর্জাতিকতাকে ভুল ভাবে শত্রু হিসেবে তুলে ধরে। তাদের আন্তর্জাতিকতার দর্শন সারা বিশ্বে বাতিল হয়ে গিয়েছে। আর্নল্ড টয়েনবির মতো ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন কীভাবে সৃষ্ট ওই মেকি আন্তর্জাতিকতাবাদ জাতীয়তাবাদের ধাক্কায় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

রুশ দেশ আর পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজম নামে একটি নতুন ধর্ম মানুষের মনে আশা জাগিয়েও পরে বাষ্পের মতো উবে গিয়েছে। এর কারণ হয়তো-বা বাইরের আবরণ দিয়েই সেই নতুন ধর্মকে মোড়া হয়েছিল। জাতীয়তাবাদ বোঝাতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ অন্তরের জাতীয়তাবোধের কথা বলেছিলেন। কেবল সেই বোধ ভারতের মানুষকে আন্তর্জাতিকতার স্তরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। আমাদের ঋষিরা তাই বলেছিলেন, 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' আর 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'। বিদেশি শিক্ষায় অসাধারণ পারঙ্গম হয়েও শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ভারতের সেই ঋষিকুলের ধারক ও বাহক। শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথায় ভারতের

শ্রীঅরবিন্দের সশস্ত্র আন্দোলন ছিল জাতীয়তাবাদী। ব্রিটিশ রাজশক্তির পদলেহী এ যুগের আর স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের কিছু ঐতিহাসিক সেই আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী বলেও চালানোর চেষ্টা করে থাকেন। তাতে তাদের লেখা বইয়ের অসত্য মূল্যায়নে কাটতি বাড়ে।

স্বাধীনতার জাতীয়তাবাদী লড়াই গোপন বৈপ্লবিক কাজের ভিতর দিয়েই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য বৈপ্লবিক প্রচার আর নিয়োগকে যথাসম্ভব গোপন রাখতে হবে। দেশজুড়ে সেই নিয়োগ আর প্রচার ছড়িয়ে দিতে হবে। তরুণ আর যুবকরা সে কাজ করবেন আর বৃদ্ধ আর বয়োজ্যেষ্ঠরা তাঁদের সমর্থনে আড়াল থেকে অর্থ সংগ্রহ করবেন।

মূলত অস্ত্র জোগাড়ের জন্য ওই অর্থ লাগবে। এর জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গোপন বৈপ্লবিক কেন্দ্র গঠন করে সশস্ত্র কার্যকলাপ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গ্রামে ও শহরে এই কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। এই সব কেন্দ্রে সামরিক কায়দায় সশস্ত্র বিপ্লবের শিক্ষা দেওয়া হতো। যুবক আর তরুণদের বোঝানো হতো কীভাবে তারা দেশ মাতৃকার জন্য বলি প্রদত্ত। শ্রীঅরবিন্দ সর্বদাই জাতীয়তাবাদের শিক্ষার উপর স্থান দিয়েছিলেন 'জাতীয়তাবোধের' ভাবনাকে। পরবর্তী সময় অনেক রাষ্ট্রবাদী জাতীয়তাবাদী নেতারা তাঁর রেখে যাওয়া সেই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তার খানিকটা আঁচ আমার দেখতে পাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী বা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের কাজকর্মের মধ্যে। ১৯২০ সালে তিনি পণ্ডিচেরিতে অবস্থানকারী শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন। শ্রীঅরবিন্দের সচিব বিপ্লবী নলিনীকান্ত গুপ্তের তৈরি সাক্ষাৎকারীদের তালিকায় ওই নাম পাওয়া যায়।

১৯৩০ সালে নলিনীকান্ত গুপ্ত ওই তালিকা বানিয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতা ডাক্তার বিএস মুঞ্জের তত্ত্বাবধানে থাকা হেডগেওয়ার তখন রাজনীতিতে কনিষ্ঠ বলে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোনো আলোচনা হয়নি। এর পাঁচ বছর পর বিজয়া দশমীতে তিনি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। মুঞ্জের সহকারী হয়েই তিনি শ্রীঅরবিন্দের কাছে গিয়েছিলেন। আরও পরে রাষ্ট্রবাদী জাতীয়তাবাদী সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক 'শ্রীগুরুজী' মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের লেখা থেকে জানতে পারি কী অসাধারণ মেধা বিচ্ছুরণের মধ্যে দিয়ে ভারতের সনাতন ধর্মকে হিন্দুরাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছিলেন। সেই সময়ের একটি সাক্ষাৎকারে শ্রীগুরুজী বলেছিলেন, 'শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষকে 'মহামাতা আর মহাদুর্গা' ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে কোনোদিন ভাবতে পারেননি। ১৯৭০ সালে তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকারের কাছে শ্রীঅরবিন্দের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব যায়। তাতে শ্রীঅরবিন্দের বিভিন্ন লেখা সব ধরনের ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের প্রস্তাব করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার শর্তাধীনে তার আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে রাজি হয়। শর্তে বলা ছিল (১) অখণ্ড ভারতের যে মানচিত্র পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে রয়েছে তা সরিয়ে ফেলতে হবে, (২) শ্রীঅরবিন্দের সমস্ত লেখা থেকে 'হিন্দু', 'হিন্দুরাষ্ট্র' আর 'সনাতন ধর্ম' কথাগুলি মুছে দিতে হবে। আশ্রমের কর্ণধার 'মাতাজী' (পণ্ডিচেরির শ্রীমা বা মিরা আল ফাসা) ইন্দিরা সরকারের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়ে বলেন, 'সরকারি আর্থিক সাহায্য তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আর যা হোক শ্রীঅরবিন্দের আত্মিক শিক্ষার পরিবর্তন অসম্ভব'। সত্তরের দশকের

নকশাল আন্দোলনেও শ্রীঅরবিন্দের বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার খানিকটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে বড়ো তফাত একটাই ছিল। তা উদ্দেশ্যের আর আদর্শের। দেশ ভেঙে চীনের দাসত্ব করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের নিয়ে নকশালরা ওই আন্দোলন শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে ছিল চীন প্রীতি। চীন দেশের নেতাদের তাদের পিতা আর মাতা সাজানো হয়েছিল। কিছু সুবিধাবাদী নাট্য ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধিজীবী চীন ব্রত পালন শুরু করেছিলেন। বিদেশি মত ধার করে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তা চালু হয়েছিল। শ্রমিক-কৃষককে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেছিল এসব নাট্যকর্মীরা। উদ্দেশ্য ছিল শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার নামে নিজেদের প্রতিষ্ঠা আর নাম তুলে ধরা। ১৯১০-এর শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে সাযুজ্য টেনে এ যুগের কিছু লেখক আর শিল্পী নকশাল আন্দোলনকে একটি হাস্যকর মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। নকশালরা ছিল দেশ-বিরোধী।

শ্রীঅরবিন্দের সশস্ত্র আন্দোলন ছিল জাতীয়তাবাদী। ব্রিটিশ রাজশক্তির পদলেহী এ যুগের আর স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের কিছু ঐতিহাসিক সেই আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী বলেও চালানোর চেষ্টা করে থাকেন। তাতে তাদের লেখা বইয়ের অসত্য মূল্যায়নে কাটতি বাড়ে। নিজেদের জিহাদি প্রতিষ্ঠা করে লোকচোখে আলাদা অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। দেশজুড়ে জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে শ্রীঅরবিন্দ বিভিন্ন 'সিক্রেট সোসাইটি' তৈরি করেন। ফরাসি উপনিবেশ পণ্ডিচেরিতে রাজনৈতিক গা-ঢাকা দেওয়ার পরেও ১৯১০-১৯১৪ পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ এইসব গোপন সশস্ত্র গোষ্ঠীর সাহায্যে দীর্ঘদিন জাতীয়তাবাদী বিপ্লব চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে অন্য ঘটনা। এই মুহূর্তে এই লেখায় তা আলোচনার কোনো সুযোগ নেই।

সব বস্তুর মতো সকল মানুষ আকার আর স্থান দখল করে থাকে। তবে তারা সময় দ্বারা আবদ্ধ। শ্রীঅরবিন্দের মতো বিশিষ্ট চিন্তাবিদ তার ব্যতিক্রম নয়। তাই তাঁকে বাড়িয়ে দেখানো অর্থহীন। ফলে ১৯১৪ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ আর্য পত্রিকায় তাঁর নিজের সম্পাদনায় যা কিছু লিখেছেন তার সবটাই যে আজও গ্রহণযোগ্য আর নির্ভুল এমন ভাবনা কেবল বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। ১৮৯৩-তে ইংল্যান্ড থেকে এদেশে ফিরে আসার পর ১৯১০ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন কাগজে লিখতে থাকেন। ১৯০৬ থেকে ১৯০৮-০৯ পর্যন্ত একটি বাংলা আর দুটি ইংরেজি কাগজের সম্পাদনা করেন। সেই সব লেখার গুরত্ব এখন কেবল শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচনার বিষয়। বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই বললেই চলে। তবে সেই লেখা থেকে একালের রাজনীতির কুশীলবরা এটা শিখতে পারবেন যে দেশমাতৃকার সেবায় তাদের কী লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কোনো ব্যক্তি কালোত্তীর্ণ নন। শ্রীঅরবিন্দও তাই। বিশ্বের সব চিন্তার মতো তাঁর চিন্তাও সময় দ্বারা আবদ্ধ। আর তা থেকে সরে এসে কেউ যদি তাঁকে অবতার বানিয়ে ফেলেন তাহলে মানুষ হিসেবে তাঁর বিশালত্ব খাটো হয়ে যেতে বাধ্য। শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাশৈলীর সব চাইতে উল্লেখযোগ্য দিক তাঁর পরিবর্তনশীল বা পরিবর্তনমূলক ভাবনা। তা যেমন ব্যাপৃত তাঁর ব্যক্তি জীবনে, তেমনি প্রসারিত তাঁর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিসরে। আর ঠিক সেই কারণেই ১৯৪৩ ও ১৯৫০ সালে তাঁকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার জন্য বহু মানুষ যাদের মধ্যে নোবেল জয়ীরাও উদ্যোগী হন। ১৯১৩ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর বন্ধু অরবিন্দ ঘোষই একমাত্র দ্বিতীয় যাঁকে ভারত থেকে সাহিত্যে নোবেল দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়েছিল সুইডিশ নোবেল কমিটি। কেন? কারণ শ্রীঅরবিন্দ চিন্তার অপূর্ব শৈলী ও মাধুর্য রয়েছে তার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। আগেই বলেছি জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবোধ নিয়ে ১৮৯৩ থেকে ১৯২০ এবং তারপরেও ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছিলেন বা ভেবেছিলেন তা এ যুগেও কীভাবে প্রাসঙ্গিক তা কেবল বোঝা যায় ওই দুই ধারণা সম্পর্কে উত্তর-আধুনিকতার তত্ত্বের প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে।

তবে জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবোধ নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ধারণায় উত্তর-আধুনিকতাবাদের প্রয়োগের অনেক বিরোধী ধারণাও রয়েছে। অল্প পরিসরে তা আলোচনা করা কঠিন, কারণ তার অনেকটাই এই যুগে গ্রহণযোগ্য। শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে জাতীয়তাবোধের যে অসাধারণ মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন তার খানিক বিচ্ছুরণ আমরা পেয়েছিলাম আলিপুর জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাঁর উত্তরপাড়ার ধর্মরক্ষিণী সভার ভাষণে (৩০ মে, ১৯০৯)। সেখানে তিনি বলেন কেন জাতীয়তাবাদের আর জাতীয়তাবোধের ধারণা বিশ্বজনীন, কারণ তা ভারতের বহুমাত্রিক সনাতন ধর্মের ধারণাকে জগতের মানবদ্বারে প্রতিষ্ঠা করে। কোনো সংকীর্ণ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত ভাবনা তাকে রোধ করতে পারে না। কেন ভারতের দৃষ্টিতে সারা বিশ্বের সকল মানুষ অমৃতের পুত্র। সে ধারণা কীভাবে ভারতে জারিত হয়েছে। গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গত ভাবনা কেন পশুবৎ। কারণ তা সত্যের থেকে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর সকল লেখার মধ্যেই বিশ্বজুড়ে অলিখিত এক ঈশ্বরের অবস্থানের কথা বলা হয়েছে যার সরলীকৃত রূপ হলো 'মানুষ'। তাই তিনি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটাতে গিয়ে ভারতীয় ঋষিদের কথা বলেছেন যেখানে তাঁর সৃষ্ট জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবোধকে তিনি সনাতন ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করেছেন আর দেখিয়েছেন কীভাবে এই সনাতন ধর্ম সকল ধর্মের চালিকাশক্তি আর শাশ্বত। তিনি বলেছিলেন ভারত নামে এই 'হিন্দুরাষ্ট্র' এই 'সনাতন ধর্মের' মধ্যেই জন্ম নিয়েছে। সনাতন ধর্মের পতন হলে সেই রাষ্ট্রের পতন হবে। সনাতন ধর্ম ধ্বংস হলে 'হিন্দুরাষ্ট্র' ধ্বংস হয়ে যাবে। সনাতন ধর্মই ভারতের জাতীয়তাবাদ আর জাতীয়তাবোধ। কারণ ভারতের সে জাতীয়তাবাদ 'ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা প্রায় অলঙ্ঘনীয় এক রাষ্ট্র নির্দেশ'। প্রয়োজনে সব প্রাণের বলিদান দিয়েও তাকে রক্ষা করাই ভারতবাসীর প্রধান কর্তব্য। এটাই শ্রীঅরবিন্দের 'সেকালের-একালের' জাতীয়তাবাদী ভাবনা। □

শ্রীঅরবিন্দের ভারতবোধ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

অরবিন্দের আবির্ভাব :

১৮৭৭ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর আদর্শে বিপিনচন্দ্র পাল (৭ নভেম্বর, ১৮৫৮-২০ মে, ১৯৩২) হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে হলেন ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে তিনি বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডে গেলেন (১৮৮৯)। বাগ্মিতার জন্য সেখান থেকে অন্য একটি বৃত্তি নিয়ে গেলেন আমেরিকায়। দুর্দান্ত সেই বক্তৃতা, শুনে মোহিত হয়ে যেতেন মানুষ; তখনও স্বামীজী আমেরিকায় পৌঁছাননি। কিন্তু প্রবল ধাক্কা খেলেন আমেরিকার জনৈক শ্রোতার কাছ থেকে; তিনি এক অতি সত্য অথচ তেতো-কথা শোনালেন বিপিনচন্দ্রকে। বললেন একজন পরাধীন দেশের মানুষের কাছ থেকে কোনো কথাই তাঁরা শুনবেন না, শুনলেও তা গ্রহণ করবেন না। কথাটি দারুণ বাজলো বিপিনচন্দ্রের বুকে। শপথ নিলেন দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতেই হবে, তার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নেবেনই তিনি। ফিরলেন দেশে, সুযোগ পেলেন কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির (বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরি) গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করার, পড়লেন অসংখ্য বই। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের দীক্ষায় দেশের সনাতনী ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতিও আগ্রহ বাড়লো। সেই সময় দেশপ্রেম আর হিন্দুত্বের প্রতি আগ্রহকে সমার্থক বলে বিবেচিত হতো।

১৮৯২ সালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে নিলেন বৈষ্ণব মতে দীক্ষা। এরপরই শুরু হলো রাজনৈতিক সক্রিয়তা, অনলবর্ষী বক্তৃতা আর সেই সঙ্গে নির্ভীক কলম। ১৯০১ সালে সম্পাদনা করলেন ইংরেজি সাপ্তাহিক 'নিউ ইন্ডিয়া'; তাতে চললো রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার। বুঝলেন দেশের কাজের জন্য বলিষ্ঠ মানুষ চাই। যোগ্য মানুষ তৈরির জন্য তাই দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করলেন। সেই সময় বাঙ্গলার রাজনৈতিক আন্দোলনকে শেষ করে দেবার জন্য বাঙ্গলাকে ভাগ করলো ইংরেজ। ১৯০৫-এ শুরু হলো বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, তার রাশ নিজের হাতে নিলেন বিপিনচন্দ্র। ১৯০৬-এর আগস্টে প্রকাশ করলেন ইংরেজি দৈনিক 'বন্দে মাতরম্', তাতে, শামিল হলেন অরবিন্দ ঘোষ। ব্যাস, আগুনে রাঙ্গা হলো বাঙ্গলার বিপ্লববাদের দাবানল। অখণ্ডতার সাধনা দিয়েই অরবিন্দের জাতীয়তাবাদ শুরু হলো। অখণ্ড বাঙ্গলার জন্য আন্দোলন। বঙ্গজননী আর ভারতমাতা অরবিন্দের কাছে হলো অভিন্ন। বাঙ্গলাকে ভাগ করতে দেওয়া যায় না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে শামিল হয়ে দেশমাতৃকার ঋণ শোধ করতে উদ্যত হলেন অরবিন্দ। এক নতুন যুগের সূচনা।

অখণ্ড ভারতবর্ষের সাধনা কেন জরুরি ?

ভারতমাতা হচ্ছেন অখণ্ড

ভারতবর্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মাতৃকা সাধনার এক সনাতনী ভৌমরূপ। ভারতবর্ষ নামে এক অতুল্য দেশকে জননী জ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তির নামই ভারতমাতা-পূজন। যে দেশে আমার জন্ম, যে দেশের সম্পদ গ্রহণ করে আমার এই শরীর, যে দেশের গৌরবে আমার অন্তঃকরণ আনন্দ লাভ করে, যে দেশ আমাকে অন্তরাত্মার সন্ধান দিয়েছে— তারই মাতৃরূপা ভারতমাতা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'আর্যবীণা' পর্যায়ে 'ভারতমাতা' নামে কবিতা রচনা করেছিলেন। 'আর্যবীণা' কাব্য-পর্যায়ে 'বিষণ্ণাভারতী', 'আয় ভারতসন্তান' প্রভৃতি কবিতাতেও ভারতমাতার আভাস দিয়েছেন ডিএল রায়। তাঁর 'রাণা প্রতাপ সিংহ' নাটকের (১৯০৫) চতুর্থ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে দেখা যায় পৃথ্বীরাজ গাইছেন যুদ্ধে আহ্বানের গান; যেন ভারতমাতা ডাক দিয়েছেন--- মুঘলদের বিপ্রতীপে দেশের পীড়িত ধর্মকে রক্ষা করতে হবে, হিন্দুস্থানের বিপন্না জননী-জায়াকে রক্ষা করতে হবে, রক্ষা করতে হবে নিলাঞ্ছিত ভারত নারীকে। আর সেজন্যই রণসাজে যেতে হবে সমরে।

'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে
গাও উচ্চে রণজয় গাথা!
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে

শুন ওই ডাকে ভারতমাতা।
কে বল করিবে প্রাণের মায়া,—
যখন বিপন্না জননী-জায়া?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে!
চল সমরে দিব জীবন ঢালি—
জয় মা ভারত, জয় মা কালী!'

এখানে ভারতমাতার স্বরূপ হচ্ছেন মহাকালী। আর ভারতমাতার সন্তানেরা কোষ নিবদ্ধ তরবারি নিয়ে লড়াই করবেন। আমরা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮১) উপন্যাসে দেশভক্তির যে ক্ষীরধারার উদ্ভব হলো, দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ সিংহ' নাটকে সেই ক্ষীর প্রবাহিত হয়ে পরিপুষ্ট লাভ করল। স্বামীজী বলেছিলেন আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতমাতাই ভারতবাসীর একমাত্র উপাস্য দেবতা। সিস্টার নিবেদিতার 'Kali the Mother' কবিতার আদর্শে ভারতমাতার ছবি আঁকলেন অবনীন্দ্রনাথ। সেই অখণ্ড ভারতবর্ষের সাধনার ব্রতী হলেন অরবিন্দ।

ভারতমাতার সামনে সংকল্প মন্ত্র উচ্চারণ করে দেশমাতাকে রক্ষা করার পুণ্য শপথ নিই আমরা। দেবীকে অর্ঘ্য সমর্পণ করে ধ্যান করা হয় অখণ্ড ভারতবর্ষের, স্মরণ করা হয় তাঁর চিন্ময়ী রূপ, সে আরাধ্য মূর্তি যেন দশভুজা দেবী দুর্গা। ভারতমাতার পুজো মানে রাষ্ট্রীয় বেড়া বাধার ব্রত, দেশকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে তোলার ব্যায়াম, ভারতবাসীর মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী গড়ে তোলার রাখিবন্ধন, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার শপথ গ্রহণ। যে মাটি আমাদের খাদ্যের ভাণ্ডার, যে মাটিতে আমাদের পদচারণা, যে মাটির বুকে আমাদের বসতি, তাকে ধন্যবাদ দেবার চিরন্তন-চিন্তনই যেন ভারতমাতার পুজো। মাটি-ই মা, মাতৃকা আরাধনার চরম দার্শনিকতা হলো ভারতমাতার পুজো। ভারতবর্ষ পুণ্য ভূমি; এই দেশ কেবল আমাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানই দেয়নি, দিয়েছে এক অচিন্ত্য বিস্ময়— 'Each soul is potentially divine.' ভারতবাসী অমৃতের সন্তান, পুণ্য-পবিত্র।

শ্রীঅরবিন্দের ভারতমাতা :

৩০ আগস্ট, ১৯০৫-এ অরবিন্দ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে (২৪ আগস্টে লেখা পত্রের উত্তরে) একটি পত্রে লিখছেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়েছেন সবই ভগবানের। যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার। যাহা বাকি রইল তাহা ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর। আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড়ো অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, আর নয়, সে পাপ জন্মের মতো ছাড়িয়া দিলাম। ...আমার ত্রিশ কোটি ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোনোমতে বাঁচিয়া থাকে। তাহাদেরও হিত করিতে হয়। ...অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে। আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কী করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে। শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ...কার্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই।...'

শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানের ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন। দেশমাতাকে দেবী দুর্গাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন বঙ্কিমচন্দ্র। বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে যে দেশমাতা, তিনি যেন দেবী দুর্গারই অন্যতম রূপ। 'বাহুতে তুমি মা শক্তি/হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি/তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।।/ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরধারিণী/কমলা কমল দল-বিহারিণী'। শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্রেও দেখতে পাই ভারতবর্ষ নামক দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য তিনি দেবীকে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রকট হতে প্রার্থনা জানিয়েছেন। 'Mother Durga! Rider on the lion, giver of all strength, Mother, beloved of Siva. We, born from thy parts of Power, we the youth of India, are seated here in thy temple. Listen O Mother, descend upon earth, make thyself manifest in this land of India.'

ভারতবর্ষকে বিশ্বের কেন প্রয়োজন?

শ্রীঅরবিন্দের Inclusive Hinduism and Social Inclusion সম্পর্কে পরিপূর্ণ মন্তব্য পাওয়া যায় তাঁর উত্তরপাড়া অভিভাষণে। তিনি হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় 'ধর্ম-রঙিনী সভা'য় এলেন ভাষণ দিতে ১৯০৯ সালের ৬ মে। এটি 'Uttarpara Speech' নামে বিখ্যাত। বললেন, 'অন্যান্য ধর্মের প্রধান কথা হচ্ছে বিশ্বাস ও মতবাদ, কিন্তু সনাতন ধর্ম হচ্ছে জীবনই; এটি এমন জিনিস যা শুধুই বিশ্বাস করবার নয়, পরন্তু জীবনে ফুটিয়ে তোলবার। মানবজাতির মুক্তির জন্যে এই ধর্মকেই পুরাকাল থেকে এই উপদ্বীপের নিঃসঙ্গতায় পোষণ করা হয়েছে। এই ধর্ম দেবার জন্যেই ভারত উঠছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় সে নিজের জন্যে উঠছে না অথবা যখন সে শক্তিমান হবে তখন দুর্বলকে পদদলিত করবার জন্যেও সে উঠছে না। যে সনাতন জ্যোতি তাকে দেওয়া হয়েছে, জগৎ মাঝে তাই বিকিরণ করবার জন্যে সে উঠছে। ভারত চিরদিনই মানবজাতির জন্যে জীবনযাপন করেছে, নিজের জন্যে নয়, আর তাকে যে বড়ো হতে হবে তাও তার নিজের জন্যে নয়, মানবজাতির জন্যে।' (বাংলা অনুবাদ : অনিলবরণ রায়) ('Other religions are preponderatingly religious of faith and profession, but the Sanatan Dharna is life itself; it is a thing that has not so much to be believed as lived. This is the Dharma that for the Salvation of humanity was cherished in the seclusion of this peninsula from of old. It is to give this religion that India is rising. She does not rise as other countriess do, for self or when she is strong, to trample on the weak. She is rising to shed the eternal

light entrusted to her over the world. India has always existed for humanity and not for herself and it is for humanity and not for herself that she must be great.')

ভারতবর্ষে সনাতনধর্ম কেন জরুরি?

শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষ এবং সনাতনধর্ম এক এবং অভিন্ন। উত্তরপাড়া অভিভাষণে তাঁর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য পেয়েছি এবং সে বক্তব্য আদতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বলে তিনি অভিহিত করেছেন। 'যখন বলা হয় যে, ভারত উঠবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম উঠবে। যখন বলা হয় যে, ভারত মহান হবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম মহান হবে। যখন বলা হয় যে, ভারত নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে। এই ধর্মের জন্যে এবং এই ধর্মের দ্বারাই ভারত বেঁচে আছে। ধর্মটিকে বড়ো করে তোলার অর্থ দেশকেই বড়ো করে তোলা।'

তখনও তিনি তথাকথিত ঋষি হয়ে ওঠেননি। মানিকতলা বোমার মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। তার আগে এক বছর কারাগারের নির্জনবাসে কাটিয়ে কারা-জাতক বাসুদেবের দর্শন পেয়েছেন। উত্তরপাড়া অভিভাষণে যা বলবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তা বলা হলো না, বরং যে কথা তিনি বললেন, তা কারা-দেবতা বাসুদেবেরই কথা, যাঁর দিব্য দর্শন পেয়েছিলেন আলিপুর জেলের কুঠুরিতে বসে। অরবিন্দ বলছেন— 'আমি বলছি, আমাদের পক্ষে সনাতনধর্মই হচ্ছে জাতীয়তা। এই হিন্দুজাতি জন্মেছিল সনাতনধর্ম নিয়ে, এর সঙ্গেই সে চলে, এর সঙ্গেই সে বিকাশলাভ করে; যখন সনাতনধর্মের অবনতি হয় তখনই জাতির অবনতি হয়, আর যদি সনাতনধর্মের ধ্বংস হওয়া সম্ভব হতো তাহলে সনাতনধর্মের সঙ্গে এই জাতিটাও ধ্বংস হতো।'

কারাগারে থেকে কোন উপলব্ধি লাভ করলেন?

শ্রীঅরবিন্দ 'কারাকাহিনী' গ্রন্থে লিখলেন, ''কারাবাসের পূর্বে আমার সকালে এক ঘণ্টা ও সন্ধ্যাবেলায় এক ঘণ্টা ধ্যান করিবার অভ্যাস ছিল। এই নির্জন কারাবাসে আর কোনও কার্য না থাকায় অধিককাল ধ্যানে থাকিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মানুষের সহস্র-পথ-ধাবিত চঞ্চল মনকে ধ্যানার্থে অনেকটা সংযত ও এক লক্ষ্যগত রাখা অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে সহজ নয়। কোনও মতে দেড়ঘণ্টা দুইঘণ্টা একভাবে রাখিতে পারিতাম, শেষে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িত। ...এমন অবস্থা হইতে লাগিল যেন সহস্র অস্পষ্ট চিন্তা মনের দ্বার সকলের চারিদিকে ঘুরিতেছে অথচ প্রবেশ পথ নিরুদ্ধ; দুয়েকটি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াও সেই নিস্তব্ধ মনোরাজ্যের নীরবতায় ভীতি হইয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিতেছে। এই অনিশ্চিত অবশ অবস্থায় অতিশয় মানসিক কষ্ট পাইতে লাগিলাম। ...জেলের ঘরের সেই নির্জীব সাদা দেওয়াল দর্শনে যেন মন আরও নিরুপায় হইয়া কেবল বদ্ধাবস্থার যন্ত্রণাই উপলব্ধি করিয়া মস্তিষ্ক পিঞ্জরে ছটফট করিতে লাগিল। আবার ধ্যানে বসিলাম, ধ্যান কিছুতেই হইল না বরং সেই তীব্র বিফল চেষ্টায় মন আরও শ্রান্ত, অকর্মণ্য ও দগ্ধ হইতে লাগিল। ...কাল যে তাহার (বিদ্রোহী মন) উপর অসহ্য ভার হইয়া পীড়ন করিতেছে, সেই চাপে চূর্ণ হইয়া সে হাঁপ ছাড়িবার শক্তিও পাইতেছে না, যেন স্বপ্নে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি গলাপীড়নে মরিয়া যাইতেছে অথচ হাত পা থাকিয়াও নড়িবার শক্তি রহিত। তখন বুঝিতে পারি নাই যে ভগবান আমার সহিত খেলা করিতেছেন, ক্রীড়াচ্ছলে আমাকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেছেন। প্রথমত, কীরূপ মনের গতিতে নির্জন কারাবাসের কয়েদি উন্মত্ততার দিকে ধাবিত হয়, তিনি তাহা দেখাইয়া এইরূপ কারাবাসের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বুঝাইয়া আমাকে ইউরোপীয় জেলপ্রণালীর ঘোর বিরোধী করিলেন এবং যাহাতে আমার সাধ্যমতো আমি দেশের লোককে ও জগৎকে এই বর্বরতা হইতে ফিরাইয়া দয়ানুমোদিত জেলপ্রণালীর পক্ষপাতী করিবার চেষ্টা করি তিনি সেই শিক্ষা আমাকে দিলেন।

ভগবানের দ্বিতীয় অভিসন্ধি বুঝিলাম, আমার মনের এই দুর্বলতা মনের সম্মুখে তুলিয়া তাহা চিরকালের জন্য বিনাশ করা। যে যোগাবস্থাপ্রার্থী তাহার পক্ষে জনতা ও নির্জনতা সমান হওয়া উচিত। বাস্তবিক অতি অল্পদিনের মধ্যে এই দুর্বলতা ঘুচিয়া গেল, এখন বোধহয় দশ বৎসর একাকী থাকিলেও মন টলিবে না। ...তৃতীয় অভিসন্ধি, আমাকে এই শিক্ষা দেওয়া যে আমার যোগাভ্যাস স্বচেষ্টায় কিছু হইবে না, শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই সিদ্ধিলাভের পন্থা, ভগবান স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া যে শক্তি, সিদ্ধি বা আনন্দ দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া তাঁহার কার্যে লাগানো আমার যোগলিপ্সার একমাত্র উদ্দেশ্য। যেদিন হইতে অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকার লঘীভূত হইতে লাগিল, সেদিন হইতে আমি জগতের ঘটনা-সকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে মঙ্গলময় শ্রীহরির আশ্চর্য অনন্ত মঙ্গল স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতেছি।''

ক্রমে যোগাভ্যাস করে শ্রীঅরবিন্দ কারাজীবনে পেলেন এক পরমানন্দের সন্ধান। তখন আর মনে হতো না, কারার উচ্চ দেওয়ালে তিনি বন্দি। সর্বত্রই দেখতেন বাসুদেবের দিব্য উপস্থিতি। কয়েদিদের দেহের মধ্যে যেন পরিলক্ষিত হচ্ছিল ভগবান নারায়ণ। সাধু পুরুষ আর ছোটোলোকের মধ্যে ভেদ খুঁজে পেলেন না। উত্তরপাড়া অভিভাষণে তিনি বলছেন, 'যে জেল আমাকে মানবজগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দি নই; আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার সেলের সম্মুখবর্তী বৃক্ষের ছায়ার তলে আমি বেড়াতাম, কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসুদেব, দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দণ্ডায়মান রয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে চাইলাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার উপর পাহারা দিচ্ছিলেন। আমার পালঙ্ক-স্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার উপরে শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন; সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের। তিনি আমার যে গভীরতর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন, এইটিই হয়েছিল তার প্রথম ফল। জেলের কয়েদিদের দিকে আমি চাইলাম— চোর, খুনি, জুয়াচোর এদের দিকে যেমন চাইলাম আমি বাসুদেবকেই দেখতে পেলাম, সেই সব তমসাচ্ছন্ন আত্মা ও অপব্যবহৃত দেহের মধ্যে আমি নারায়ণকেই দেখতে পেলাম। ...ভগবান আমাকে বললেন, দেখ, কী সব লোকের মাঝে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি আমার একটু কাজ করবার জন্যে। যে-জাতকে আমি তুলতে চাই এই হচ্ছে

তার স্বরূপ এবং এই কারণেই আমি তাদের তুলতে চাই।

অরবিন্দকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুভব :

শান্তিনিকেতনে বসে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ৭ই ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'নমস্কার' কবিতাখানি; যার শুরুতেই চমক, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!' পাণ্ডুলিপির পাতার উপরে 'ওঁ' লিখে শুরু করছেন কবিতা। পরের দুই পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে, অরবিন্দকে কবির সম্বোধন— 'হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্তি তুমি'। কয়েক পঙ্‌ক্তিতে অরবিন্দের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য— 'তোমা লাগি নহে মান, /নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান/ চাহ নাই, কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি/বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি!' অরবিন্দের সঙ্কট যাত্রাপথে 'আরাম' যে লজ্জিত শিরে নত হয়; 'মৃত্যু' ভুলে যায় ভয়। তিনি বিধাতার শ্রেষ্ঠ-দান; কারণ তিনি পূর্ণ বিশ্বাসে দেশের হয়ে যেতে চাইছেন 'পূর্ণ অধিকার', সত্যের গৌরব। আর বিধাতাও যেন প্রার্থনা শুনেছেন, তাই বেজে উঠেছে জয়শঙ্খ।

অরবিন্দ কারাবরণ করেছেন (১৯০৮ সালের ২ মে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য 'নবশক্তি' পত্রিকার কার্যালয় থেকে গ্রেপ্তার এবং ৫ মে থেকে আলিপুর জেলে বন্দি)। তাই তাঁর ডান হাতে আজ 'কঠোর আদর'। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, এই কারা বেদনা থেকেই দেশের মানুষ বল পাবেন। অরবিন্দ 'রুদ্রদূত', দেবতার প্রদীপ হাতে করেই তাঁর আবির্ভাব। তাই কেউই তাঁকে শাস্তি দিতে সক্ষম হবেন না। এমনকী তাঁর বন্ধন-শৃঙ্খল তারই চরণ বন্দনা করছে, কারাগার জানাচ্ছে অভ্যর্থনা। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, মিথ্যাবাদী রাজা তার রাজদণ্ড প্রয়োগ করেছেন এমনই এক ব্যক্তিত্বকে যিনি সৃষ্ট হয়েছেন প্রলয়-অনলে; যিনি পেয়েছেন প্রাণ মৃত্যু হতে। অরবিন্দ যেন বিধাতার নিজের হাতে গড়া হাসিমুখ ভক্ত, আর তাকেই তিনি বিনা অস্ত্রে পাঠিয়েছেন শত্রুর মাঝে রাতের অন্ধকারে। এ কেমন খেলা তবে কিছুই কি নেই দুঃখ, ক্ষত, ক্ষতি, সর্বভয়? তবে কিছুই কি নেই রাজা, রাজদণ্ড, মৃত্যু, অত্যাচার? যদি তা নাই থাকে, যদি বিধাতা পুরুষ নিজের সৃষ্টিকে ভয়ের পরিমণ্ডলে পাঠাতে পারেন অনায়াসে, তবে কেন আমরা ভীরু, মূঢ় হয়ে মাথা নামিয়েছি নীচে? কেন বলতে পারছি না, তোমার চির-সত্তা স্থির শাশ্বত-সত্য বলেই আমাদের মাথা উঁচু করে তুলতে হবে।

অরবিন্দের 'সাবিত্রী' কাব্যগ্রন্থে জাতীয়তাবোধের পরশ :

বিপ্লবী ও মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ একজন প্রতিষ্ঠিত কবিও ছিলেন। আঠেরো বয়স থেকে কবিতা রচনা করেছেন। বরোদায় থাকাকালীন কর্মজীবনেও তিনি গীতিকবিতা লিখেছেন, তার পরতে পরতে বেদান্ত-দর্শন উদ্ভাসিত। কবির কাছে কবিতা হলো 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর', বিশেষত কবি অরবিন্দের কাছে তো বটেই। 'The future poetry' গ্রন্থে তাই তিনি লিখেছিলেন, 'দিব্য এক আনন্দ— যে আনন্দ একাধারে ব্যাখ্যাতা, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ঘাটয়িতা এবং রূপনির্মাতা, সেই আনন্দকেই— কবির আত্মা অনুভব করে থাকে।'

ইংরেজি ভাষায় লিখিত 'সাবিত্রী' কাব্যগ্রন্থ তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে বিবেচিত হয়। একে মহাকাব্য বলেও অভিহিত করেছেন কেউ কেউ। তাঁর সব কবিতার মধ্যেই গভীর দর্শনবোধ প্রকাশিত হয়েছে। তবে 'সাবিত্রী'র ভাব ও ভাষা সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে। শ্রীঅরবিন্দের কবিসত্তার কালজয়ী নিদর্শন হলো 'সাবিত্রী'। ব্যাসদেবের মহাকাব্য 'মহাভারত'-এর সাবিত্রী-সত্যবান অংশটি কাহিনির মূল আকর হলেও, শ্রীঅরবিন্দের কাব্যিক সুষমায় এবং ভাবনার নতুনতর নির্মাণে তা হয়ে উঠেছে এক অপরূপ অধ্যাত্ম-তত্ত্ব। কাশীদাসী মহাভারতে (১৫৯৫ থেকে ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিখিত) যমের প্রসঙ্গ রয়েছে আদিপর্বে 'সাবিত্রী সত্যবান' আখ্যানে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কাব্যে ব্যাসদেব ও কাশীরাম দাসের এই আখ্যানটিকেই দীর্ঘায়িত করেছেন। ব্যাসদেবের বর্ণিত চরিত্রের অনর্জীবনে ব্যাপকতর পরিবর্তন করে, তাতে আরোপ করেছেন অভূতপূর্ব প্রতীকী। ব্যাসদেব সাবিত্রী-সত্যবান অংশ শেষ করেছেন সাতশো ছত্রে; 'সাবিত্রী'র মোট পঙ্‌ক্তি ২৩,৮১৩; 'সাবিত্রী' ১২টি পর্বে এবং ৪৯টি সর্গে বিভাজিত।

বনে কাঠ কাটতে গিয়ে সহস্র নাগের দংশনে মৃত্যু হলো সত্যবানের। পতিব্রতা সাবিত্রী মৃতদেহ ছেড়ে উঠলেন না, অপেক্ষা করলেন যমদূতদের আগমনের জন্য। যমদূতেরা এলেন, কিন্তু সাবিত্রীর তেজোময়ী রূপের সম্মুখে মৃতদেহ ছুঁতে পারলেন না। যমরাজ নিজেই এলেন এবার। সাবিত্রীকে বলছেন, 'কাল পূর্ণ হলো আজি লয়ে যাই আমি।' সাবিত্রী বাধা দিলেন না, আবার কোনো কথাও বললেন না। চললেন যমরাজের পিছু পিছু। যম এবার সাবিত্রীর অনুগমন নিরস্ত করতে ব্রতী হলেন, প্রবোধ দিলেন, সতী-স্ত্রী হিসেবে অনন্য সুখ্যাতি করলেন, বললেন, 'সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্যবর।' সাবিত্রীর প্রার্থনা এবার 'হেনমতে দেহ মোরে শতেক নন্দন।' অসতর্ক যমরাজ সম্মত হলেন, দিলেন সেই বর— 'মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি।' সাবিত্রী তখন যমরাজকে বলছেন, এ কেমন করে সম্ভব? মৃত সত্যবানের সাধ্বী স্ত্রী কীভাবে শত পুত্রের জননী হতে পারেন? বিধবা রমণী একমাত্র অসতী হলেই তা সম্ভব! এইবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে পুনর্জীবন দান করে গেলেন সত্যবানকে।

মহাভারতের সাবিত্রী চরিত্র আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, মানব জীবনও দিব্য জীবনে রূপান্তরিত হতে পারে। এই বোধের দ্বারা চালিত হয়েই শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রী চরিত্রে যোগবলের বিকাশকে অন্যতর মাত্রা দিয়েছেন। এ যেন সাবিত্রীর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ নিজের যোগ-সত্তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন; ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন নিজের তপস্যার সুলুকসন্ধান। বিশেষত সাবিত্রী-যম সাক্ষাৎকার হলো, শ্রীঅরবিন্দের স-উপলব্ধ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। এই মহাকাব্যের মধ্যে পুরাণের অতীতচারিতা থাকলেও তা ভবিষ্যৎ ভাবনাকে প্রকটিত করতে চেয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের মূল উদ্দেশ্য কাহিনি নির্বাচন এবং কাহিনির আংশিক পুনর্নির্মাণের দ্বারা বার্তাবহ হয়ে রয়েছে।

সতীসাধ্বী সাবিত্রীর সাধনা তাঁর স্বামী সত্যবানকে নবজীবন দান করেছে। কাব্যের সমাপ্তিতে তারই আনন্দরাগ যেন প্রকৃতিকে করে তুলেছে প্রাণবন্ত। সাবিত্রীর ক্রোড়ে সত্যবান, জেগে উঠছেন তিনি, সহধর্মিণীকে তাই প্রশ্ন করেছেন, সাবিত্রী উত্তর দিচ্ছেন—

'আমাদের জীবন শুরু হলো ভগবানের সঙ্গে মিলে গিয়ে।
তবুও তো মর্ত্য ভালোবাসার আনন্দ বিন্দুমাত্র হ্রাস হয়নি।
স্বর্গের স্পর্শ পৃথিবীকে পূর্ণ করে ধরে, তাকে লুপ্ত করে না...

চেয়ে দেখ, আমি সেই একই নারী, যে এসেছিল একদিন তোমার কাছে

এই বনভূমির প্রান্তে রৌদ্রকরোজ্জ্বল লতা-পত্রের মৃদু মর্মরের মাঝে...

তোমার চিন্তার তোমার আশার তোমার প্রয়াসের অন্তরঙ্গ সহচর...

এই জগৎকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে,

তবে এ হলো এখন ভগবানের ক্রীড়াক্ষেত্র, তাঁর আবাসগৃহ,

ভগবান লুকিয়ে রয়েছেন পাখির মধ্যে পশুর মধ্যে মানুষের মধ্যে যাতে

তিনি আবার মধুরভাবে নিজের সঙ্গে মিলিত হন প্রেমের আশ্রমে ঐক্যের আশ্রয়ে।'

এ কি অরবিন্দ ঘোষের কারামুক্তিরই এক অভিব্যক্তি! নতুন জীবন! নিজেকে পৃথিবীর সঙ্গে নতুন করে ভগবান সামীপ্য নিয়ে বাঁচা! পার্থিব জীবনেই পরমানন্দের আস্বাদন?

আত্মসাধনা সম্পূর্ণ হলে সব কবির বাণী একই মনে হয়! কবি যখন অসীমের গূঢ়তত্ত্ব নিজের মধ্যে বাজিয়ে নেন আপন মনের তানপুরায়, তখন বিশ্বপ্রাণ আপনিই ধরা দেয়— সংকল্পিত প্রাণের মানস-মন্দিরে। তখন যেন শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ আলাদা কোনো কবি নন, তারা এক শাশ্বত-কবিরই চির-আত্মা।

'The Golden Light' কবিতায় শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন,

'The Golden Light came down into my throat,
'And all my speech is now a tune divine.
A paean song of thee my single note,
My words are drunk with Immortals wine.'

এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানটির তফাত কোথায়?

'তোমারি ঝরনাতলায় নির্জনে

মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন ক্ষণে।' এ তো 'বিরাট'-এর বোধন মানবাত্মায়! দেবলোকের অরূপে পরিপূর্ণ মানবলোকের পুণ্য-কলস।

ধর্মরাজ্য স্থাপন সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের মতামত :

শ্রীঅরবিন্দ 'গীতার ভূমিকা' গ্রন্থে লিখছেন, '...একত্ব, সাম্রাজ্য বা ধর্মরাজ্য সংস্থাপন শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। মগধরাজ জরাসন্ধ পূর্বেই এই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শক্তি অধর্ম ও অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব ক্ষণস্থায়ী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভীমের হাতে বধ করাইয়া সেই চেষ্টা বিফল করিলেন। ...রাজা ধর্মরক্ষা করিবেন, প্রজারঞ্জন করিবেন, দেশরক্ষা করিবেন। প্রথম দুই গুণে যুধিষ্ঠির অতুলনীয় ছিলেন, তিনি ধর্মপুত্র, তিনি দয়াবান, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যকর্মা, প্রজার অতীব প্রিয়। শেষোক্ত আবশ্যক গুণে তাঁহার যে ন্যূনতম ছিল, তাঁহার বীর ভ্রাতৃদ্বয় ভীম ও অর্জুন তাহা পূরণ করিতে সমর্থ ছিলেন। ...শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠির দেশের প্রাচীন প্রণালী অনুসরণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন এবং দেশের সম্রাট হইলেন। ...শ্রীকৃষ্ণ যেমন ধার্মিক তেমনই রাজনীতিবিদ। তিনি কখনও সদোষ, অহিতকার বা সময়ের অনুপযোগী প্রণালী, উপায় বা নিয়ম বদলাইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি যুগের প্রধান বিপ্লবকারী। ...সন্দেহ নাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল, কুরুধ্বংস, ক্ষত্রিয়ধ্বংস ও নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য এবং ভারতের একত্বস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য।

ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যে যুদ্ধ, সেই ধর্মযুদ্ধ, সেই ধর্মযুদ্ধের ঈশ্বরনির্দিষ্ট বিজেতা, দিব্যশক্তিপ্রণোদিত মহারথী অর্জুন।' শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়ে মনে হয় ভারতবর্ষে ও পশ্চিমবঙ্গে এমন ব্যক্তির চালকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার যার মধ্যে যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনের সমবেত ঐশ্বর্য রয়েছে। ভাগবত শক্তির মোহন চূড়া নরশ্রেষ্ঠের কপালে জয়টীকা পরিয়ে দেবে এবং সমগ্র বিশ্ব সাক্ষী থাকবে সেই ধর্মরাজ্য স্থাপনের।

রাজনীতি ছাড়া জাতীয়তাবাদের আর কিছু পন্থা?

একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার, রাজনৈতিক-জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের রাজনৈতিক আঙ্গিক ব্যতিরেকেও অনান্য পন্থা রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন :

১. 'বন্দে মাতরম্'-এর মতো সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা ও সম্পাদনার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ উজ্জীবিত করা যায়। আজকের দিনে বিক্রি হয়ে যাওয়া সাংবাদিক, সম্পাদক ও অপরাপর সংবাদ-মাধ্যমগুলি দেখিয়ে দেয়, দেশবিরোধিতার কৌশল শিক্ষিত সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং অজান্তেই তারা প্রতিবেশী দেশের প্যাসিভ সাপোর্টার হয়ে যান। কাজেই সুস্থ সাংবাদিকতাও একটি দেশপ্রেম।

২. দেশপ্রেম জাগ্রত হয় দেশের মাঙ্গলিক ও শুভঙ্করী ঐতিহ্যের সঙ্গে মানসিক নৈকট্যে। অরবিন্দের অগুনতি লেখা সেই ভারতবোধ সঞ্জাত।

৩. রাষ্ট্রবাদী শিক্ষা ব্যবস্থায় যোগ্য সঙ্গত করাও দেশপ্রেম। শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে সে পথ দেখিয়েছেন।

৪. ভারতের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির অনুসরণ মানেই জাতীয়তাবোধ, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উত্তরপাড়া অভিভাষণে তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন, অন্যত্রও তার প্রকাশ আমরা বারে বারে দেখেছি।

৫. সামাজিক মেলবন্ধন ও মিলনমন্দির ভাবনা এক অনবদ্য জাতীয়তাবোধের প্রকাশভূমি। শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হিন্দু মিলন মন্দির, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের 'শাখা', শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব প্রচার কেন্দ্র প্রভৃতিকে এককথায় সামাজিক জাতীয়তাবোধের প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস বলা যায়।

কাজেই প্রত্যেক ভারতবাসী তার পরিস্থিতি অনুযায়ী জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের কাজ করবেন। রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধ নিঃসন্দেহে একটি জোর-ঝটকা, সময়ে সময়ে অধিক প্রাসঙ্গিক, কিন্তু জাতীয়তাবোধের ভিত্তিভূমি নড়বড়ে হলে চলে না। অন্য নানান পথে সমন্বিতভাবে এগোতে হবে, তবেই গৈরিক-জাতীয়তাবোধ ভারতরাষ্ট্রে চিরায়ত (sustainable) সংস্কৃতির অঙ্গ হবে। নইলে 'বানের জল' এসে রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধকে 'ঘোলা' করে দেবেই, সুতরাং 'সাধু সাবধান'। □

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

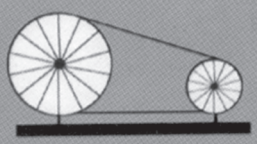

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

ঋষি অরবিন্দের বিপ্লব সাধনা

অধ্যাপক (ড.) স্বাগত বসু

অরবিন্দ ঘোষ একাধারে ছিলেন চরমপন্থী বিপ্লবী নেতা, অন্য দিকে দার্শনিক ও অধ্যাত্মপুরুষ। তাঁর বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনকে অনায়াসে দুটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথমার্ধে তাঁর পরিচয় চরমপন্থী বিপ্লবী নেতা। দ্বিতীয়ার্ধে তিনিই আবার অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক।

ইংরেজি ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতায় ভারতের এই মহামনীষী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন অবিভক্ত বাঙ্গলার রংপুর জেলার জেলা সার্জন। তাঁর মা স্বর্ণময়ী দেবী ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ চাইতেন বালক অরবিন্দের মধ্যে যেন ভারতীয় সংস্কৃতির কোনো ছোঁয়া না থাকে। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে খুব সম্ভবত মনে করতেন পিছিয়ে পড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক ব্যবস্থা। ভাবতেন সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতি বালক অরবিন্দকে সঠিক পথে চালিত করবে না। তাই মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ছোট্ট অরবিন্দকে ইংরেজি শিক্ষার জন্য দার্জিলিঙে লোরেটো কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখানে দু' বছর শিক্ষা লাভের পর পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে ও তাঁর দুই ভাইকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁরা তিন ভাই রেভারেন্ট ড্রিয়ুইট এবং মিসেস ড্রিয়ুইটের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষালাভ করেন। এরপর ১৮৮৪ সালে ১২ বছর বয়সে অরবিন্দকে লন্ডনের সেন্ট পলস স্কুলে ভর্তি করা হলো। সেখানে তিনি গ্রিক, ল্যাটিন ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা ও জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ওই বয়সেই ফরাসি ও জার্মানিতে অনর্গল কথা বলতে পারতেন।

স্কুলের গণ্ডি পার হবার পর তিনি আইসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কিংস কলেজে বৃত্তির পরীক্ষায় বসেন এবং সফল হন। কিছুদিন পর আইসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় একাদশতম স্থান অধিকার করেন কিন্তু ব্রিটিশের অধীনে কাজ করার ইচ্ছে না থাকায় ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় আর উপস্থিত হলেন না। সেই সময় বরোদার মহারাজাও ইংল্যান্ডে ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ আইসিএস অথচ ব্রিটিশদের অধীনে কাজ করতে অনিচ্ছুক শুনে উনি অবাক হয়ে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দের মতো উপযুক্ত কাউকেই উনি খুঁজছিলেন বরোদা স্টেটে কাজ করার জন্য। বরোদার মহারাজা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন বরোদা স্টেটে কাজ করার জন্য। তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে শ্রীঅরবিন্দ ভারতভূমির উদ্দেশে রওনা হলেন। শ্রীঅরবিন্দের বরোদায় আগমনের ফলে ভারতবর্ষ একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী আগামী দিনের এক অধ্যাত্মবাদী দার্শনিককে পেল। তাই শ্রীঅরবিন্দের বরোদায় আগমন ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

বরোদা স্টেটের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করার পর মহারাজার বক্তৃতা লেখার জন্য তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। জীবনে এই প্রথম অরবিন্দ সুযোগ পেলেন ভারতীয় সংস্কৃতিকে জানার, বোঝার এবং উপলব্ধি করার। এর আগে তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতিকে এতো কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। বরোদার মহারাজার গ্রন্থাগারে যে বিপুল গ্রন্থ বা পুস্তকের সমাহার ছিল সেই বইগুলোই তাঁর জীবনকে অন্য খাতে নিয়ে গেল। অরবিন্দ গ্রন্থাগারের বইয়ের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে তার থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির অমৃত আস্বাদন করলেন।

নিয়মিত সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি ও সাহিত্য নিয়ে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। কিছু সময় পরে তিনি বরোদা কলেজে ফরাসি ভাষার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হলেন। পরবর্তীকালে তাঁকে বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। এই সময় থেকেই তাঁর মন শৃঙ্খলিত ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের দিকে আকৃষ্ট হয়। যদিও তাঁকে শৈশব থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে দূরে রাখা হয়েছিল তবুও তাঁর জিজ্ঞাসু মন ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া পাওয়ার জন্য আকুল ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতিকে গভীর ভাবে জানার পর তিনি অন্তরতম প্রদেশ থেকে উপলব্ধি করতে পারলেন যে এই সুপ্রাচীন সংস্কৃতি এক কথায় অনন্য। পৃথিবীর আর কোথাও এত প্রাচীন অথচ গভীরতায় ভরা সংস্কৃতি পাওয়া যাবে না। অন্য আঙ্গিকে বলতে গেলে সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি তাঁর অন্তঃস্থলে এক নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটালো। সেই সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন এই সংস্কৃতি এবং এই দেশ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ। এই প্রথম তিনি পরাধীনতার জ্বালা উপলব্ধি করতে পারলেন। তাঁর মন একটু একটু করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে আকৃষ্ট হতে লাগলো। যদিও এর আগে তিনি কেমব্রিজে থাকাকালীন 'ইন্ডিয়ান মজলিসে' বেশ কিছু ভাষণ দেন যেগুলো ব্রিটিশদের চোখে ব্রিটিশ বিরোধী। ফলে তাঁর এই বৈপ্লবিক ভাষণগুলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থে আঘাত লাগায় তারা তাঁকে সতর্ক করে।

অন্যদিকে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি যিনি সমগ্র দেশবাসীর কাছে বাঘাযতীন নামে পরিচিত তিনি বরোদার সেনাবাহিনীতে ভর্তি হলেন। তিনি সামরিক শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করেও সুযোগ পাচ্ছিলেন না। অবশেষে বরোদার সেনাবাহিনীতে সুযোগ পেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর দেশের তরুণদের সামরিক শিক্ষা দান করে তাদের নিয়ে একটি সামরিক বাহিনী তৈরি করবেন এবং ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। বরোদা অঞ্চলেই তিনি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হন। কালক্রমে বাঘা যতীন কলকাতা এসে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন।

বরোদায় থাকাকালীন শ্রীঅরবিন্দ 'ইন্দুমতী' পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখালেখি করেন। প্রবন্ধগুলোর বেশিরভাগ বিষয় ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায়। পত্রিকাটি তৎকালীন বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হতো। 'NEW LAMP FOR THE OLD' এই নামে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি নরমপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি জাতিকে আত্মত্যাগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং প্রয়োজনে চরমপন্থা অবলম্বন করে রক্ত ঝরানোর আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বান বৃথা যায়নি। অসংখ্য বিপ্লবী স্বাধীনতার জন্য বলিদান দিয়েছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ এরপর বঙ্গপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণ করে সেখানকার বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হন। সেই সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা, গঙ্গাধর তিলক এবং মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ভগিনী নিবেদিতা বাঙ্গলার বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি বিপ্লবীদের বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করতেন। এদিকে সেই সময় কলকাতায় প্রতিষ্ঠা হয়েছে জাতীয় মহাবিদ্যালয়। ভগিনী নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ করলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করার জন্য। বাঙ্গলায় তখন বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার চলছে। শ্রীঅরবিন্দ বুঝলেন বিপ্লবের এই মহাযজ্ঞে নিজেকে শামিল করার এটাই উপযুক্ত সময়। তিনি এটাও বুঝতে পারলেন এই মুহূর্তে তাঁর বাঙ্গলায় থাকা খুবই জরুরি। কাজেই ভগিনী নিবেদিতার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে তিনি বরোদার উপাধ্যক্ষ পদ ছেড়ে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করলেন। ১৯০৫ সালে যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন হয় সেই আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভাবে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর চিন্তায় আন্দোলনের রূপরেখা ছিল বিদেশি দ্রব্য বা সরকারি স্কুল বর্জন, খাজনা এবং কর না দেওয়া। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙ্গলায় বেশ কয়েকটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯০২ সালে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই সমিতির ছাতার তলায় অনেক ছোটো ছোটো ক্লাবও চলে আসে। পরে ঢাকা ওয়াড়িতেও প্রমথনাথ মিত্রের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির একটি শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে স্বাধীনতাকামী অসংখ্য তরুণ যুক্ত হয় এবং লাঠি খেলার শিক্ষা গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে গোপনে ছুরি ও পিস্তল চালানোর শিক্ষাও তাদের দেওয়া হতো। উদ্দেশ্য ছিল ভারত ভূমি থেকে বিদেশিদেরকে বিতাড়িত করে দেশকে স্বাধীন করা। শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলায় ফিরে আসার পরেই বাঙ্গলা জুড়ে তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। তিনি বাঙ্গলায় আসার পর তাঁর অনুজ বারীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র কানুনগো এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

মানিকতলায় বাগানবাড়িতে শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্বাবধানে বারীন ঘোষের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু হলো। অনুশীলন সমিতির কাজ ও উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে মানুষের কোনো সংশয় না থাকে; এছাড়া সমিতির চিন্তা ধারা ও আদর্শ যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে বারীন্দ্র ঘোষ 'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ বিরোধী লেখা প্রকাশের জন্য 'যুগান্তর' পত্রিকার উপর ব্রিটিশ শাসকের খাঁড়া নেমে আসে। সরকার বিরোধী লেখার জন্য ১৯০৭ সালে শ্রীঅরবিন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে কিন্তু প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতা লাভের জন্য একদিকে প্রকাশ্যে কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন আবার অন্যদিকে চরমপন্থী বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে গোপনে জড়িত ছিলেন।

মুরারি পুকুরে বাগান বাড়িতে বিপ্লবীরা বৈপ্লবিক কাজের জন্য প্রচুর বোমা তৈরি করেন। হেমচন্দ্র কানুনগো সুদূর ফ্রান্স থেকে বোমা তৈরির পদ্ধতি শিখে এখানে তা প্রয়োগ করেন। মজফ্ফরপুরে কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টায় তাঁর তৈরি বোমাই ব্যবহার করেছিলেন ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকী। অন্য মতে উল্লাসকর দত্তের বানানো বোমা ব্যবহার হয়েছিল। যাইহোক, মজফ্ফরপুরে কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টায় কলকাতা পুলিশের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হলো।

লালবাজারে জরুরি বৈঠকের পর মাঝরাত থেকে মুরারিপুকুরে, গ্রে স্ট্রিটে এবং কলকাতার অন্যান্য জায়গায় পুলিশ হানা দেয় এবং তল্লাশি করে। মুরারিপুকুর থেকে বোমা এবং বোমা তৈরির মসলা ও অন্যান্য সরঞ্জাম পাওয়া যায়। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র কানুনগো-সহ প্রায় ৩৯ জন গ্রেপ্তার হলেন। গ্রে স্ট্রিটের বাড়ি থেকে ভোর চারটের সময় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নববিবাহিত স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর সামনে থেকে গ্রেপ্তার হলেন। বেশ কিছুদিন ধরে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা বা মুরারিপুকুর বোমার মামলার শুনানি চলল। শ্রীঅরবিন্দের হয়ে মামলার ভার নিলেন সেই সময়ের নবীন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি দিনরাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করে অবশেষে শ্রীঅরবিন্দকে আইনের ফাঁক দিয়ে বার করে নিয়ে আসেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন নরেন গোস্বামী রাজসাক্ষী হয়ে যায়, ফলে শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য বিপ্লবীরা বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়ে যান। ওদিকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জেলের মধ্যেই গুলি করে নরেন গোস্বামীকে হত্যা করেন। ফলে প্রমাণের অভাবে শ্রীঅরবিন্দ মুক্ত হলেন। কিন্তু বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত ও হেমচন্দ্র কানুনগোর ফাঁসির আদেশ এবং অন্যান্যদের দীর্ঘ মেয়াদের জেল হলো। যদিও উচ্চ আদালতের রায়ে ফাঁসিকে দ্বীপান্তরে পরিবর্তন করা হলো।

১৯০৯ সালের মে মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শ্রীঅরবিন্দ মুক্ত হলেন বটে কিন্তু জেল থেকে মুক্তির পরে তিনি রাজনীতি এবং বিপ্লবী কাজ থেকে একটু একটু করে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে তাঁর মুক্তির পর শ্রীঅরবিন্দ জনসাধারণের জন্য উত্তরপাড়ায় ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁর প্রথম বক্তব্য রাখেন। গত এক বছর ধরে আলিপুর জেলে কাটানোর সময় তাঁর যে উপলব্ধি হয়েছিল সেই সম্বন্ধেই তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক যুক্তিবাদী বক্তব্য রাখেন। সনাতন হিন্দু ধর্মের যে অন্তর্নিহিত অর্থ তিনি তাঁর অন্তঃস্থল থেকে উপলব্ধি করেছেন সেটাই তিনি সেইদিন জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করলেন। শ্রীঅরবিন্দ যখন উত্তরপাড়ায় বক্তৃতা দিতে এলেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কিছু বলা উচিত কারণ আলোচনা সভাটা ধর্ম সংক্রান্ত।

কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এটাও উনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে নির্দিষ্ট বক্তব্য রাখার জন্য তাঁর এখানে আগমন সেটা হয়তো তিনি রাখতে পারবেন না, কারণ তিনি কী বলবেন সেটা স্থির করার মালিক তিনি নন। তার মালিক এক অদৃশ্য শক্তি। সেই অদৃশ্য শক্তিই ঠিক করবেন তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতাটি। তাঁর উপলব্ধিতে সেই অদৃশ্য শক্তি হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। সেই অদৃশ্য শক্তির উপলব্ধি তাঁর প্রথম হয় আলিপুর জেলে। সেখানেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁকে দিয়ে অন্য কাজ করানোর। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কাজ রাখা আছে। সেই কাজই তাকে করতে হবে। সেই কাজ অন্যকে দিয়ে করা যাবে না। আবার এই বিপ্লবের কাজ বা কংগ্রেস নেতা হিসেবে যে রাজনৈতিক কাজ তিনি করছেন বা তাঁর প্রতিবাদী লেখার মাধ্যমে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন জনগণের মধ্যে সেই কাজটা কিন্তু এই মুহূর্তে থেকে আর তাঁর কাজ নয়। সেই কাজের ভার বহন করার জন্য ঈশ্বর অন্যকে কাউকে বেছে রেখেছেন।

জেল থেকে বেরিয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন পরিচিত যে সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এক বছর আগে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে চরম ব্যস্ত ছিলেন আজ তারা ব্রিটিশের কারাগারে। বিশেষত যে দুজনের কাছ থেকে তিনি অনুপ্রাণিত হতেন এবং সমস্ত সময়ে সঠিক পরামর্শ পেতেন সেই বালগঙ্গাধর তিলক এবং বিপিন চন্দ্র পাল ব্রিটিশ কারাগারে। তিনি কারাগারের অন্তরালে যাবার আগে লক্ষ্য করেছিলেন যে সেই মুহূর্তে সমস্ত দেশ স্বাধীনতার আন্দোলনে উদ্বেলিত। সমগ্র জাতির মনে স্বাধীনতা লাভ করার এক অদম্য বাসনা ভর করেছিল। কিন্তু আজ এক বছর পরে তাঁর যেন মনে হচ্ছে সমগ্র জাতি যেন দিগ্‌ভ্রান্ত, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। কোন রাস্তা তাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে সেটাই সে নির্ণয় করতে পারছে না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই অদৃশ্য শক্তি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যিনি সমগ্র জাতিকে এই মুহূর্তে সেই আন্দোলনের পথ পরিহার করে আত্মানুসন্ধানে নিমগ্ন করেছেন। তাই সর্বত্র নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। হয়তো ভবিষ্যতে সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আরও ভয়ংকর ঝড় নিয়ে আসবেন। সেই ঝড়ই আবার নতুন পথের সন্ধান দেবে। সেই ঝড়েই হয়তো ব্রিটিশ শক্তি কেঁপে উঠবে এবং সেই ঝড়ের ফলেই হয়তো বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতারও উদয় হবে। তিনি আরও বলেন যে এক বছর আগে বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেল থেকে মুক্তির পর উত্তরপাড়াতে এবং অন্য জায়গায় নিজের উপলব্ধির কথা জানাতে আসেন। বিপিনচন্দ্র পাল তখন তাঁর বাণী দ্বারা জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। বক্সার জেলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই বিপিনচন্দ্র পালের হৃদয়ে উপলব্ধির বাণী গেঁথে দেন। বিপিনচন্দ্র পাল বুঝেছিলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই তাঁকে এবং সমগ্র জাতিকে চালনা করছেন। পরবর্তীকালে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর বক্তব্যে সেটাই প্রকাশ করেন।

শ্রীঅরবিন্দ যখন গ্রেপ্তার হন অল্প সময়ের জন্য হলেও তিনি হতাশ হন। পরবর্তীকালে তিনি যখন ভগবত গীতায় মনোনিবেশ করেন তখন গীতার মর্মার্থ যেন অতীতের থেকেও অনেক বেশি করে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন এবং একটু একটু করে বুঝতে পারলেন ভগবান ভক্তের কাছে কী আশা করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর আশু কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান সর্বদাই চান ভক্ত কাজ করে যাবে ফল তার অনুকূলেই যাক বা প্রতিকূলেই যাক। আসলে কাজের ফলতো ভগবান নিজেই তৈরি করে রেখেছেন। তাই তিনি ভক্তের কাছে শুধু কাজ চান। যেমন মহাভারতের যুদ্ধে কী হবে সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানতেন। জয়-পরাজয়ের মীমাংসা তো তিনি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ধর্মের কাছে অধর্মকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এই উপলব্ধির কথাই সেদিন তিনি উত্তরপাড়াবাসীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর উত্তরপাড়া অভিভাষণ স্পষ্টত এটাই প্রমাণ করে যে এক বছরের কারান্তরাল তাঁর চিন্তাকে এক খাত থেকে

অন্য খাতে নিয়ে যায়। তাঁর উপলব্ধিকে চিন্তার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নিতে সাহায্য করে। তিনি বৈপ্লবিক চিন্তার জগৎ থেকে ক্রমশ দূরে সরে অধ্যাত্মবাদের জগতে মনকে নিয়ে যান।

শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন ভগবদ্‌গীতার অন্তর্নিহিত বাণীই ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধের মন্ত্রে দীক্ষিত করবে। একটা সময় তিনি জাতীয়তাবোধকে সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা করেছিলেন। যদিও তার বাস্তবায়ন শেষ পর্যন্ত হয়নি। কিছু সমালোচক মনে করেন শ্রীঅরবিন্দ কিছুটা হলেও ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্মীয় অনুপ্রবেশের জন্য দায়ী। যদিও বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। আসল কথা হচ্ছে মুঘল, পাঠান ও তুর্কিদের ভারতবর্ষে আগমন ও ক্ষমতা দখল এবং সেই সঙ্গে রাজশক্তির ক্ষমতার অপব্যবহারে সনাতন হিন্দুদের ব্যাপক হারে ধর্মান্তরিত করার ফলে রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ অনেক আগেই ঘটে গেছিল। সেই সঙ্গে মুসলমানদের ভারতীয়দের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারা এবং ভারতকে জন্মভূমি কল্পনা করতে না পারাও একটা কারণ তাদের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করার ক্ষেত্রে।

শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শান্তিপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামও হতে পারে যদি অস্ত্রের জোগান থাকে। স্বাধীনতার জন্য যে কোনো পথই অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে যাঁদের সংগ্রামের পথে অনীহা তাঁরা মহাভারতের যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণে বাণীকে স্মরণ করতে পারেন। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন স্বাধীনতা ভিক্ষার দ্বারা পাওয়া যায় না তাকে অর্জন করতে হয়। সেই সঙ্গে তিনি মনে করতেন যে স্বাধীনতার জন্য যে কোনো পথই সঠিক যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটা জাতীয়তা বিরোধী হয়। তিনি সমকালীন অনেক রাজনৈতিক নেতার থেকে চিন্তাধারায় এগিয়ে ছিলেন। তিনি মনে করতেন ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষের প্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা এবং মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করবে। তাই তিনিই প্রথম স্বরাজের দাবি তোলেন। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় বহরমপুরে কংগ্রেসের সম্মেলনের জন্য লেখায় তিনি স্বরাজের স্বপ্ন দেখান। তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে বিদেশি জিনিস বর্জন, স্বদেশিকে নিজের করে নেওয়া এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি— এই তিনটি কর্মসূচির উপর জোর দেবার আবেদন করেন এবং বলেন এই তিনটি স্তম্ভই স্বরাজ এনে দেবে। তিনি বলতেন বাণিজ্যিক (অর্থনৈতিক) এবং শিক্ষাক্ষেত্রে স্বরাজ প্রাথমিক ভাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই দুই ক্ষেত্রে স্বরাজই রাজনৈতিক স্বরাজ অর্জনের পথ সুগম এবং ত্বরান্বিত করবে। যদিও তৎকালীন অনেক বিখ্যাত দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদের সেই সময় স্বরাজের দাবির কথা চিন্তা করার শক্তি তো ছিলই না বরং স্বরাজের দাবিকে তাঁরা অবাস্তব ভাবতেন। স্বরাজের দাবি তোলার জন্য তাঁকে উন্মাদ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেই আখ্যা তাঁকে দিয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহান মনীষী।

তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন যেমন 'বন্দেমাতরম্', 'কর্মযোগীন', 'ধর্ম' ও 'আর্য' পত্রিকা। তবে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা যা প্রথমে বিপিনচন্দ্র পাল, মাঝে শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর গ্রেপ্তারের পরে আবার বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদনা করেছিলেন তা স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বড়ো অবদানের স্বাক্ষর রেখেছিল। আমরা জানি ভারতের স্বাধীনতা এসেছিল দুটি পথ বেয়ে। একটা পথ ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের। সেই পথ বেয়ে চলেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু এবং আরও অসংখ্য বিপ্লবী। আর একটি পথ ছিল অহিংসার পথ যে পথ গান্ধীজী অবলম্বন করেছিলেন। এই দুটি পথই ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে অস্ত্র। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা এই দুটি পথ বেয়েই এসেছিল। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুটি পথেরই স্রষ্টা। একদিকে তিনি বাঙ্গলার চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থেকে সেই আন্দোলনকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, অন্যদিকে অসহযোগ আন্দোলন একটু একটু করে কী পদ্ধতিতে এগোবে সে সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর লেখা প্রবন্ধে উল্লেখ করে গেছেন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের অনেক আগেই। অসহযোগ আন্দোলন সংক্রান্ত এই প্রবন্ধগুলো 'Passive Resistance' নামে বইতে পাওয়া যায়।

দেশবাসীর কাছে খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হলো গান্ধীজী কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের অবদানের কথা কখনো স্বীকার করেননি। বরং তিনি প্রকাশ্যে Tolstoy, Thoreau প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেন অসহযোগ আন্দোলনের চিন্তার প্রবর্তক হিসেবে। কিন্তু তাঁর বক্তব্যে শ্রীঅরবিন্দের নাম অনুল্লেখ থেকে গেছে যেটা একজন ভারতবাসী হিসেবে মনে করি অনভিপ্রেত। তাঁর বক্তব্যে এবং লেখায় শ্রীঅরবিন্দ 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' এই শব্দটি খুব ব্যবহার করেছেন। পরে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কী তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তাঁর চিন্তাধারায় যখন অন্য কোনো উপায় থাকবে না তখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অংশ হিসেবে সমস্ত রকম বিদেশি পণ্য বয়কটের পথ অবলম্বন করতে হবে। এভাবেই বিদেশি শক্তিকে আঘাত করতে হবে।

১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তারের একটা সম্ভাবনা দেখা দিল। খবরটা পাওয়ার পরেই শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর যাওয়া স্থির করলেন কারণ সেই সময় চন্দননগর ফরাসিদের অধিকারে ছিল। শ্যাম পুকুরের 'কর্মযোগিন' পত্রিকার অফিসের সামনে পুলিশ পাহারা থাকায় সেইদিন বিকেলে পত্রিকার অফিসের পিছনের দেওয়াল বেয়ে নেমে আহিরিটোলার গঙ্গার ঘটে গেলেন। সেখান থেকে রাত্রিবেলা নৌকো করে চন্দননগরে পৌঁছলেন। প্রায় মাস খানেক চন্দননগরে থাকার পর ছদ্ম-পরিচয়ে মার্সাই নামে একটি ফরাসি জাহাজে করে পণ্ডিচেরি পৌঁছলেন। বিশিষ্ট তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী ওখানে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন এবং সেই সঙ্গে শোভাযাত্রা সহযোগে অভ্যর্থনা দেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি পণ্ডিচেরিতে ছিলেন। দার্শনিক হিসেবে তিনি এখানেই পূর্ণতা লাভ করেন। তাঁর এই পর্বের ইতিহাসটা ভারতীয়দের জন্য আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দর্শনই শ্রীঅরবিন্দকে বিপ্লবীর আসন থেকে ঋষির আসনে বসিয়েছিল। □

আত্মিক মুক্তিমার্গের যাত্রায় প্রাণবন্ত আত্মা শ্রীঅরবিন্দ

অমিত ঘোষ দস্তিদার

পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কাজের প্রসঙ্গে বলেন— 'আমার কাজ এই অপূর্ণ পার্থিব জগৎকেই নিয়ে, অন্য কোনো জগতের প্রয়োজনে নয়... এ আশ্রম অন্যান্য কোনো আশ্রমের মতো নয়— এখানকার অধিবাসীরা কেউ সন্ন্যাসী নয়; এখানকার যোগের লক্ষ্য কেবল মোক্ষলাভই নয়। এখানকার সাধনা হলো এমন এক কাজের জন্য প্রস্তুতি— যে কাজ কেবল যোগচেতনা ও যোগশক্তির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হবে, তার অন্য কোনো ভিত থাকবে না।'

পণ্ডিচেরি আশ্রমের উদ্ধৃতি— 'সন্ন্যাসী ও ঋষির প্রভেদ সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে.... শ্রীঅরবিন্দ হলেন ঋষি। সন্ন্যাসীর আদর্শে যাকে বলে ত্যাগ, তা সম্পূর্ণ করতে পারা তার পক্ষে সম্ভব নয় যার মধ্যে করুণাস্থান আছে... যে সন্ন্যাসী জগৎকে এবং আপন পরিধেয়কে পর্যন্ত বর্জন করেছে সে বৈদিক ঋষিদের রীতির অনুগামী নয়। তখনকার ঋষিরা সন্ন্যাসী ছিলেন না, একেবারেই না। তাঁরা ছিলেন দ্রষ্টা, যাঁরা পরম সত্যকে দেখতেন ও যার অনুভূতি পেতেন। যে সত্য শাশ্বত ও চিরন্তন যা কোনো দেবতাদের দ্বারা সৃষ্ট বা নষ্ট হয় না, তাঁকেই তাঁরা ব্যক্ত করতেন।'

অরবিন্দ আশ্রমের লক্ষ্য--- 'সংখ্যাবর্ধকতা আমরা চাই না, আমরা চাই নির্বাচিতদের; তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছাত্রদের নয়, কিন্তু প্রাণবন্ত আত্মাদের।' যারা নতুন কিছু করতে এই ধরাধামে আসে তারা সুখনীড় পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করে না, তারা নিজের নিরাপত্তার কথা না ভেবে পাড়ি দিতে পারে অজানার উদ্দেশে। সময় হলেই তাদের মধ্যে তাগিদ আসে, এই তাগিদ বাইরের নয়, তার ঠিকানা ভিতরের, একই কেউ বলে থাকেন ঈশ্বর নির্দেশ, কেউ বলে থাকেন অন্তরের নির্দেশ।'

৬ মে, ১৯০৯। একটি গোপন চিঠি গেল দার্জিলিঙে গ্রীষ্মকালীন বসবাসকারী বেঙ্গল গভর্নমেন্টের চিফ সেক্রেটারি এফ.ডব্লুউ ডিউকের কাছে (confidential No. 3135SB dated 6th May, 1909)। বিষয় : অরবিন্দের সহপাঠী ব্যারিস্টার বিচক্রফ্টের প্রদেয় রায়ে অরবিন্দ-সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের মুক্তি। এই রায়ে ব্রিটিশরা খুশি হয়নি বরং তাদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। অনেকে উচ্চ আদালতে আপিল করার কথাও বলেছিল। অরবিন্দের মুক্তি হলো ঠিকই কিন্তু যে কোনো সময় ব্রিটিশরা তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করতে পারে, এমন সম্ভাবনা থেকেই গেল। অরবিন্দ-সহ মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবীরা সোজা চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ি চলে যান। অরবিন্দ সেখান থেকে চলে যান তাঁর মেসোমশাই কৃষ্ণগোপাল মিত্রের ৬নং কলেজ স্কোয়ারের বাড়িতে। 'কর্মযোগীন' পত্রিকা এখান থেকেই প্রকাশ করতেন অরবিন্দ। 'ধর্ম' নামেও একটি পত্রিকা তিনি প্রকাশ করতেন। ছাপা হতো শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর ভাই গিরিজাসুন্দর চক্রবর্তীর ছাপাখানা থেকে।

১৯১০ সালের ২৪ জানুয়ারি।

কলকাতার আদালত চত্বরে পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট শামসুল আলম খুন হন। অরবিন্দ ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্নরকম দমন-পীড়নমূলক নীতিকে দায়ী করে আগুন ঝরা লেখা লিখলেন। এর দু'-একদিন পর নিবেদিতা অরবিন্দের কাছে এলেন। নিবেদিতা 'কর্মযোগীন' ও 'ধর্ম' পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব নিলেন। বারীন ঘোষের 'অগ্নিযুগ'-এর লেখা থেকে জানা যায়— 'নিবেদিতার অনুরোধে 'ধর্ম' ও 'কর্মযোগীন'-এর কাজ ছেড়ে অরবিন্দ গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য চন্দননগরের পথে পণ্ডিচেরি চলে গিয়েছিলেন।' ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ' বইতে স্পষ্ট বলেছেন, 'উল্লেখযোগ্য যে, নিবেদিতাই অরবিন্দকে ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিসের নাগালের বাইরে অন্যত্র গিয়ে থাকবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।' ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চন্দননগরে অরবিন্দকে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন যিনি, সেই মতিলাল রায় তাঁর লেখা 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' গ্রন্থে জানাচ্ছেন— 'শামসুল আলম হত্যাকাণ্ডে শ্রীঅরবিন্দকে সংজড়িত করার সংবাদ ভগিনী নিবেদিতার কর্ণে পৌঁছাইয়াছিল। এই সময়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র ভগিনী নিবেদিতার সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রায় প্রতি অপরাহ্নেই বেড়াইতে আসিতেন। শ্রীঅরবিন্দকে পুনরায় বন্দি হইতে না হয় তাহার জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও সিস্টার নিবেদিতা উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, শ্রীঅরবিন্দকে আত্মগোপন করারই অনুরোধ করা হইবে। শ্রীঅরবিন্দের নিকট সেই প্রস্তাব ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং উপস্থিত করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার প্রস্তাব শুনিলেন, কিন্তু তখনই গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ইহার অত্যল্পকাল পরেই তাঁর নিজের অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রত্যাদেশের বাণী ফুটিয়া উঠিল— চন্দননগর যাও।'

অরবিন্দ নিবেদিতার দেওয়া বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' পড়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে দিনের পর দিন আলোচনা হতো। অরবিন্দ প্রায়শই নিবেদিতার বাড়ি এবং নিবেদিতা প্রায়শই অববিন্দের বাড়ি যাতায়াত করতেন। কারণ অরবিন্দ নিজেই বলেছেন— 'Then about my relation with sister Nivedita-they were purely in the field of politics. Spirituality or spiritual matters did not enter into them and I do not remember anything passing us on these subjects when I was with her.' (Sri Aurobindo, on Himself)। কিন্তু কারাগারেই তিনি উপলব্ধি করতেন বিবেকানন্দের উপস্থিতি— 'It is a fact that I was hearing constantly the voice of Vivekananda Speaking to me for a fortnight in the jail in my solitary meditation and felt his presence...' (Sri Aurabindo, on Himself)।

অরবিন্দ সবসময় ভারতের মানুষের সার্বিক স্বাধীনতার কথা ভাবতেন। ১৯০৮ সালের ৩১ জানুয়ারি তিনি নাগপুরে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন— 'It (India) will take its place at the side of the Independent nations of the world; it will educate other nations; it will shed the luster of true knowledge,... our nation will come forward to benifit the human race.' উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি অরবিন্দের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছিলেন শুধু নন, চন্দননগর থেকে পণ্ডিচেরি যাবার অন্যতম সংঘটক, তাঁকে অরবিন্দ বলেছিলেন— 'ভারতের স্বাধীনতা না হইলে মানুষের মুক্তিই হইবে না।'

'অরবিন্দ-অনুরাগী রাজেন্দ্রমোহন/অরবিন্দ-যাত্রাতরে করিয়া যতন/শতাধিক মুদ্রা প্রেরে জাহাজ ভিতরে—/শেষ অর্ঘ্য ইহা তাঁর দেবতার তরে।/দুই ছদ্মনামে দুই টিকিট কিনিয়া,/সুগোপনে অরবিন্দে দেন পাঠাইয়া— /'শ্রী যতীন্দ্র মিত্র'— নাম অরবিন্দ ধরে,/'বঙ্কিম বসাক— নাম বিজয়ের তরে।' —অরবিন্দ প্রসঙ্গে রজত চক্রবর্তীর একটি লেখা থেকে প্রাপ্ত— রঘুনাথ দাসের লেখা এই ছড়া আমাদের জানাচ্ছে, অরবিন্দ, 'যতীন্দ্র মিত্র' ছদ্মনামে আর তাঁর সঙ্গী বিজয় নাগ 'বঙ্কিম বসাক' ছদ্মনামে জাহাজে যাত্রা করলেন পণ্ডিচেরির উদ্দেশে। জাহাজ তখন ছাড়তো চাঁদপাল ঘাট থেকে। জাহাজের নাম 'ডুপ্লে'। রাত তখন এগারোটা। ১ এপ্রিল, ১৯১০। ৩১ মার্চ ১৯১০ অরবিন্দ চন্দননগরের বোড়াইচণ্ডিতলা ঘাট থেকে রওনা হন। সে রাতের কথা মতিলাল রায় লিখছেন— 'তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সন্ধিক্ষণ মাত্র।। চারিদিক নিস্তব্ধ— কেবল রাত্রিচর প্রাণীর অস্পষ্ট শব্দ শুনা যাইতেছিল। আকাশে আধখানা চাঁদ ভাসিতেছে। ধরণী জ্যোৎস্না-প্লাবিতা। তখনও দারুণ গ্রীষ্মের আরম্ভ হয় নাই; বসন্তপবন দেহ শীতল করিয়া দিল। শ্যাম তৃণদলে শিশির পড়িতেছে; চন্দ্রকিরণে যেন তাহা নক্ষত্রখচিত বলিয়া মনে হইতেছিল। সম্মুখে প্রবাহিনী ভাগীরথী চূর্ণ হীরক খনির চক্ষু ঝলসিয়া দিল। দেখিলাম, শ্রীঅরবিন্দ নদীতটে দাঁড়াইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।' নৌকা ভাসল জলে। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চিঠি পাঠিয়েছিলেন নগেন্দ্রকুমার গুহরায়কে— 'আমার কাছে সংবাদ পাঠালে মতিলাল যে, তারা একখানি নৌকা করে অরবিন্দকে আগরপাড়ার ডুমুরতলার ঘাটে আনবে, আমি একখানি উত্তরপাড়ার নৌকা নিয়ে তাঁকে সেই নৌকা করে আগরপাড়া থেকে 'ডুপ্লে'তে তুলে দিয়ে আসব। নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের বর্ণনা— 'গঙ্গাবক্ষে নৌকায় অরবিন্দের রাত্রি কাটিল। পরদিন উত্তরপাড়ার অদূরে একটি ঘাটে নৌকা ভিড়িল। সেই রাত্রিতেই তিনি পণ্ডিচেরির যাত্রী হইয়া কলকাতার চাঁদপাল ঘাটে 'ডুপ্লেক্স' জাহাজে ওঠেন।'

অরবিন্দ ৩১ মার্চ চন্দননগর ত্যাগ করেছিলেন আর ১ এপ্রিল বঙ্গভূমির মাটি। এই সম্পূর্ণযাত্রা পরিকল্পনার পরিচালক ছিলেন তাঁর মাসতুতো ভাই সুকুমার মিত্র।

জাহাজ নদী পেরিয়ে সমুদ্রে ভাসল। বিপুল তরঙ্গের ওপরে অসীম শান্ততায় আরেক অরবিন্দের সাধনপথ ধীরে ধীরে অতিক্রম করা শুরু হলো। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মানবমুক্তির দর্শন ও চিন্তনে সবসময় এক অতীন্দ্রিয়ের আদেশের কথা বলেছেন— 'All was the working of an ancient plan/A way prepared by an Unerring Guide.'

একজন আদ্যন্ত যুক্তিবাদী মানুষ এক নতুন আত্মিকমুক্তির রাস্তা দেখাবার প্রকল্পনায় পূর্ণযোগে মুক্তির পথে পা বাড়ালেন এক চরম কিন্তু সম্পূর্ণ নিজস্ব সাধনক্ষেত্রের দিকে। ভারতীয় ধর্ম, ভারতীয় দর্শনের এ এক অত্যাশ্চর্য ভাবাদেশ যাকে অন্তরাদেশও বলা যেতে পারে। এমন উচ্চমার্গে সবাই তো পা রাখতে পারেন না। এমন পথই তো দেবত্বের পথ— তাই দৈবাদেশ বললেও অত্যুক্তি হয় না। ■

হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ আজও অব্যাহত

মন্দার গোস্বামী

হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রার উপর পরিকল্পিত, সঙ্ঘবদ্ধ অক্রমণ আজও অব্যাহত। কিছুদিন আগেই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় রামনবমীর মিছিলে নারকীয় জেহাদি তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করেছে সমগ্র দেশ। জন্মাষ্টমী, গণেশ পূজা, দুর্গা পূজা-সহ হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় শোভাযাত্রায় পাথর নিক্ষেপের খবর এখন প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে এমন খবর প্রায়ই শোনো যায়। এখন লন্ডন-সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতেও হিন্দুদের শোভাযাত্রায় নিয়মিত ও সংগঠিত হামলা হচ্ছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে যে এক নিশ্চিত বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কাজ করছে। কিছুদিন আগেই খোদ লন্ডনে গণেশ পূজার শোভাযাত্রা আক্রান্ত হলো। কয়েকদিন আগে মহরমের মিছিলের পশ্চিমবঙ্গেই একটি দুর্গা মন্দির ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। অথচ হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রা এদেশে, বিদেশে বারবার আক্রান্ত হয়, অবরুদ্ধ হয়, লাঞ্ছিত হয়। অধিকাংশ স্থানই প্রতিবাদহীন অসহায়, বুদ্ধিজীবীরা যথারীতি নির্বাক। দু' একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে বহুল প্রচারিত সংবাদগুলিও যাকে চুপ, অথবা আক্রান্তদের কাউকে আক্রমণকারী 'প্রমাণে' ব্যস্ত।

এবার টার্গেট শিব পুজো। হরিয়ানায় মুসলমান অধ্যুষিত নুহ জেলার মেওয়াটে ৩১ জুলাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে দেবাদিদেব মহাদেবের 'ব্রজ মণ্ডল জলাভিষেক যাত্রার' আয়োজন করা হয়েছিল। গত তিন বছর ধরেই উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা জেহাদিদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। শিব ভক্তরা যখন পূজার্চনায় ব্যস্ত, তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি গুজব রটিয়ে দিয়ে শুরু হলো জিহাদিদের পরিকল্পিত আক্রমণ। প্রথমে পাথর ছুঁড়ে মানুষদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়, তারপর গুলি বোমা। অনেকে ছুরিকাহত হয়। মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েও রেহাই পাওয়া যায়নি। ভীতসন্ত্রস্ত নারী, শিশুরা যখন মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় নেয়, তখন মন্দিরকে ঘিরে ধওে শুরু হয় পাথর বৃষ্টি। পুড়িয়ে দেওয়া হয় অসংখ্য গাড়ি। শুরু হয় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। এমনকী স্কুলবাসও রেহাই পায়নি জেহাদিদের হাত থেকে। খবর পেয়ে পুলিশ প্রশাসন যখন অবরুদ্ধ ভক্তদের উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে, তখন তাদের উপরেও চলে পাথব বৃষ্টি, গুলি, বোমা। প্রশাসনের গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ-সহ বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। এলাকা থমথমে, ইন্টারনেট পরিষেবা সম্পূর্ণ স্তব্ধ। সমগ্র এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এভাবেই কি বারবার হিন্দুদের শোভাযাত্রা আক্রান্ত হবে? এটাই কি ভবিতব্য?

একসময় বিন কাসিম, ঘোরি, বক্তিয়ার খিলজী, আলাউদ্দিন খিলজীদের নৃশংস আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেছে এই দেশ। হাজার হাজার মন্দির, শিক্ষা কেন্দ্রগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মিশরের জনৈক ইসলামি আইন বিচারক সুলতান আলাউদ্দিনকে লিখেছিলেন, 'শুনিলাম আপনি নাকি হিন্দুদের এমন অবস্থা করিয়াছেন যে, তাহারা মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ কাজ করিয়া আপনি ইসলাম ধর্মের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। একমাত্র এই কাজের জন্যই আপনার সকল পাপ স্খলন হইবে।' আলাউদ্দিন, বখতিয়ারদের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীরা আজও এদেশে বর্তমান। তাই তো অমরনাথ তীর্থযাত্রায়, তীর্থযাত্রীদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় জঙ্গিদের বুলেট, গ্রেনেডের আক্রমণে। এতো গেল জেহাদি আক্রণের পরম্পরা। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বে, খ্রিস্টান প্রভাবিত রাজ্যগুলিতেও হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় বিক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ ঘটে চলেছে। একসময় খ্রিস্টান অধ্যুষিত মেঘালয়ে দুর্গাপূজা প্রায়ই নিষিদ্ধ ছিল।

খ্রিস্টান কট্টরবাদীরা নানা ছলছুতোয় অশান্তি পাকিয়ে, পূজার আগেই ১৪৪ ধারা জারি করতে বাধ্য করত। অসমে দুর্গাপূজা প্যান্ডেলে নির্বিচারে গুলি বৃষ্টি হয়েছে। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুরে প্রায়ই একই পরিস্থিতি। পাড়ায় পাড়ায় চার্চ কমিটি। তাদের একাংশের প্রত্যক্ষ মদতে, বিদেশি শক্তির সহায়তায়, খ্রিস্টান নাগা কুকি উপজাতিদের ঘরে ঘরে রয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। খ্রিস্টান জঙ্গিদের ভয়ে শোভাযাত্রা তো দূর ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ঘরের মধ্যেই পালন করতে আশঙ্কিত হচ্ছে হিন্দুরা। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতীয়তাবোধের পুনরুন্মেষ ঘটলেও আজও সমগ্র হিন্দু সমাজ সম্পূর্ণ সুসংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। তাই যতদিন না পর্যন্ত সমগ্র হিন্দু সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে, যতদিন না হিন্দু সমাজে রাষ্ট্রীয় চেতনার বিকাশ ঘটছে, ততদিন হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রার উপরে আক্রমণ চলছে চলবে। ■

গোপালী আশ্রমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত বৈঠক

গত ২২-২৩ জুলাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় খড়্গপুরের কাছে পরিষদের বহুমুখী সেবাপ্রকল্প কেন্দ্র গোপালী আশ্রমে। দক্ষিণবঙ্গের ৩৪টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ২২টি জেলার প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিনায়করাও দেশপাণ্ডে পুরো সময় উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের কার্যবৃদ্ধির কথা ভেবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী বিভাগ প্রচারক মানিক পালকে দক্ষিণবঙ্গ সহ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। উপস্থিত সকলে তাঁকে অভিনন্দন জানান। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় সহ সেবা প্রমুখ স্বপন মুখার্জি শৌর্য জাগরণ যাত্রা সম্পর্কে সকলকে অবগত করান।

ক্ষেত্র ও প্রান্ত অধিকারী-সহ বৈঠকে উপস্থিত ১৮০ জন কার্যকর্তা কার্যবৃদ্ধির সংকল্প গ্রহণ করেন। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি মহারাজ। বৈঠক সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালনা করেন প্রান্ত সহ সম্পাদক অরিন মণ্ডল।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে শ্রী শিব মহাপুরাণ কথা

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম কলকাতা-হাওড়া মহানগর সমিতির উদ্যোগে পুরুলিয়ায় জনজাতি কলেজ ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণকল্পে এবং সেবাকাজ বিস্তারের লক্ষ্যে কলকাতা সল্টলেক যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের দ্য স্ট্যাডল ব্যাঙ্কয়েটে গত ১৮ থেকে ২৪ জুলাই শ্রীশিবমহাপুরাণ কথা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আচার্য শ্রীমৃদুল কান্ত শাস্ত্রীর মুখে প্রবচন শোনার জন্য প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত শত শত মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। ২৩ তারিখে প্রবচন শুরুর প্রারম্ভে কল্যাণ আশ্রম পরিচালিত গোসাবা ছাত্রীনিবাসের ১২ জন ছাত্রী দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্র পরিবেশন করে। এদিন বিশেষভাবে তিনজনকে সম্মানিত করা হয় যাঁরা কল্যাণ আশ্রমে পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রথম জন ডাক্তার চুনারাম মুর্মু। তিনি বর্তমানে কল্যাণ আশ্রমের রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। দ্বিতীয় অনল কুমার কিস্কু। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। তৃতীয় শ্রীপতি টুডু। তিনি পুরুলিয়া সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষার অধ্যাপক। উল্লেখ্য, তিনি সাঁওতালি ভাষায় ভারতের সংবিধান অনুবাদ করে জনজাতিদের মধ্যে সংবিধান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন। এর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেছেন। উল্লেখ্য, সাত দিনের শ্রীশিব মহাপুরাণ কথা অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত থেকে প্রবচন শুনেছেন এবং কল্যাণ আশ্রমের উন্নতিকল্পে আশানুরূপ অর্থ দান করেছেন।

শিলিগুড়ি সংস্কার ভারতীর বার্ষিক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সম্প্রতি সংস্কার ভারতী শিলিগুড়ি শাখার উদ্যোগে স্থানীয় দীনবন্ধু মঞ্চে উপস্থাপিত হলো বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'দেশ আমার স্বদেশ আমার'। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রর সাংসদ রাজু বিস্ত, মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ক শঙ্কর ঘোষ-সহ বহু সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিত্ব।

অনুষ্ঠানের সূচনায় শিলিগুড়ি সংস্কার ভারতীর সংগীত, নৃত্য ও বাদ্যবিধার সদস্যদের সম্মিলত উপস্থাপনা সংগঠনের ভাবসংগীত 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী' উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করে। প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর বিশিষ্ট অতিথিদের বরণ ও সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁরা সকলেই সমাজে সংস্কার ভারতীর ভূমিকা উল্লেখ করেন। এইপর সংগীত, নৃত্য, নাটক, বাদ্য, চিকিৎসা এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বেশ কয়েকজন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে গুণীজন সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

এর পর পবিবেশিত হয় শিলিগুড়ি শাখার সংগীত ও আবৃত্তি বিধার বিশেষ নিবেদন 'দেশ আমার স্বদেশ আমার' গীতি আলেখ্য। স্বার্থান্বেষী স্বৈরাচারী শক্তির অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের নিরন্তর মুক্তি সংগ্রামের প্রেক্ষিতে স্বদেশিযুগের পাঁচজন কবির অপ্রচলিত পাঁচটি গানের সুপ্রয়োজিত সমবেত সংগীত সকলের সংপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করে। গীতি আলেখ্যর পরে সংস্কার ভারতীর বিভিন্ন চর্চাকেন্দ্রর শিল্পীরা একে একে পরিবেশন করেন সমবেত দেশাত্মবোধক সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি। লোকসংস্কৃতি বিধার পরিবেশনায় উপস্থাপিত লুপ্তপ্রায় 'মারুনি' লোকনৃত্য দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দান করে।

এদিনের অনুষ্ঠানের সর্বশেষ নিবেদন সামাজিক সমরসতার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' পরিবেশন করেন সংস্কার ভারতী শিলিগুড়ির নৃত্যবিধার সদস্যরা। অসাধারণ শিল্প নিপুণতায় মূর্ত হয়ে ওঠা নৃত্যনাট্যের প্রতিটি চরিত্র দর্শকদের মুগ্ধ করে। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বারুইপুর সেবা ভারতীর রক্তদান শিবির

বারুইপুর সেবা ভারতীর উদ্যোগে এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহযোগিতায় গত ৩০ জুলাই দক্ষিণ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৩০ জন রক্ত দান করেন। উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালী, জেলা সঙ্ঘচারলক শিবদাস বিশ্বাস, নগর সঙ্ঘচালক সমীর সাহা, সেবা ভারতীর সহ সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ।

ফঃ ৪

শ্রী গঙ্গেশ্বর মহাদেব মন্দিরে সামূহিক রুদ্রাভিষেক

ভারতীয় সংস্কৃতি সংবর্ধন সমিতির উদ্যোগে গত ৩১ জুলাই পুরুষোত্তম মাস উপলক্ষ্যে পতিতপাবনী গঙ্গাতটে (বাবুঘাটে) শ্রী গঙ্গেশ্বর মহাদেব মন্দিরে প্রখ্যাত জ্যোতিষাচার্য শ্রীরাকেশ কুমার পাণ্ডের পৌরোহিত্যে ১১জন পণ্ডিত দ্বারা সামূহিক রুদ্রাভিষেকের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীপাণ্ডে বলেন, ভূত-ভবিষ্যতের দ্রষ্টা ভগবান শঙ্করের রুদ্রাভিষেক আমাদের দৈহিক, দৈবিক ও ভৌতিক শোক তাপ থেকে মুক্তি প্রদান করে এবং জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রদান করে। সংস্থার সচিব শৈলেশ বাগড়ী ভগবান শিবের স্বরূপ তথা জীবন দর্শনের বিষয়ে কুইজের আয়োজন করেন, তাতে ১২ জন স্কুল পড়ুয়া-সহ ৪০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট যজমান রূপে উপস্থিত ছিলেন রাজেশ সারডা, যোগিতা সারডা, কণিষ্ক সারডা, নৈনিকা সারডা, অজয় খণ্ডেলওয়াল, নীরজ সাংগানেরিয়া, মুকুন্দদাস রাঠী এবং অনিল জৈন। মহাবীর বজাজ, অজয় মিশ্রা, মহেশ কেডিয়া, অজয় কুমার সরাফ, সঞ্জয় মণ্ডল, কমল শাহ, রাজকুমার ভালা, যতিন সেবক, নীতীন আর্য, বৃজেশ বাগড়ী, রাজকুমার লাঠ, দিনেশ কেডিয়া, ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি, অপূর্ব পাণ্ডে , পূর্ণিমা কোঠারী, শম্ভু মোদী, বিমলকুমার বিড়লা, শান্তা বিড়লা, পূর্ণিমা চক্রবর্তী, প্রীতি সেঠিয়া, ব্রজেশ ঝা, গুড্ডন সিংহ, অরুণ সিংহ-সহ বহু ব্যক্তি সপরিবার রুদ্রাভিষেকে অংশগ্রহণ করেন।

সন্ধ্যায় মহাআরতির পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কলকাতা মহিলা বিকাশ মঞ্চের উদ্যোগে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা জ্ঞানযজ্ঞ

গত ২৫জুলাই কলকাতা মহিলা বিকাশ মঞ্চের উদ্যোগে স্থানীয় বৈকুণ্ঠনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে অষ্টদিবসীয় শ্রীমদ্ ভাগবত কথা জ্ঞান যজ্ঞের শুভারম্ভ হয়। কথাকার রূপে ব্যাসপীঠে বিরাজমান ছিলেন রাজস্থানের বিকানেরের পণ্ডিত বিজয় ব্যাস। প্রথমে গণেশ মন্দির থেকে শোভাযাত্রা-সহ কলসযাত্রার আয়োজন করা হয়, যাতে বহু মা-বোন সহ পুরুষ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে প্রদীপ প্রজ্বলন করে প্রবচনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শিশির বাজোরিয়া। শ্রীবাজোরিয়া মহিলা বিকাশ মঞ্চের মহিলাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে বলেন, ভারতের উন্নতি মহিলাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে এবং তাঁদের প্রয়াসেই সম্ভব হবে। জ্ঞানযজ্ঞের মুখ্য যজমান ছিলেন সুনীল-সুমিত্রা হর্ষ।

বিশিষ্ট সমাজসেবী সুকুমার রায়চৌধুরীর স্মরণসভা

পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রম বুনিয়াদপুর শাখার উদ্যোগে গত ৩০ জুলাই বুনিয়াদপুর চৌধুরী লজে বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রবীণ স্বয়ংসেবক প্রয়াত সুকুমার রায়চৌধুরীরর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী সমিতির সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী, পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের আশিস কুমার দাস, প্রাবোধ কুমার নন্দ, শ্রীমতী চাপালি চাকমা, নিখিল মজুমদার, শ্রীমতী শান্তি মার্ডি, রবি সরকার, অমল তরফদার, কল্যাণ আশ্রমের উত্তর দিনাজপুর জেলার সভাপতি গৌরহরি চক্রবর্তী, উত্তরবঙ্গ কল্যাণ আশ্রমের সভাপতি চন্দন মুর্মু, দেবাশিস ভট্টাচার্য প্রমুখ। ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় কার্যকর্তা গৌতম সরকার, কল্যাণ আশ্রমের পূর্বক্ষেত্র গ্রাম বিকাশ প্রমুখ আশিস কুমার দাস, উত্তরবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ সোরেন, বিশিষ্ট চিকিৎসক অমল কুমার ঘোষ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ কুমার অধিকারী এবং সহপ্রান্ত কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত। সকলেই প্রয়াত সুকুমার রায়চৌধুরীর কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ করেন।

শ্রদ্ধার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন অনুষ্ঠান

গত ১৬ জুলাই বীরভূম জেলার বিশিষ্ট সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধা তাদের ১৩৭-তম শ্রদ্ধা নিবেদন করে সিউড়ি চাঁদনীপাড়া নিবাসী প্রবীণ স্বয়ংসেবক দিলীপ কুমার ঘোষকে, তাঁরই বাসভবনে। ওঙ্কার ধ্বনি এবং সিউড়ি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নবীন সন্ন্যাসী স্বামী বরদানন্দ মহারাজের হস্তে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। শ্রীঘোষের জ্যেষ্ঠবধূমাতা শ্বশুরমহাশয়ের চরণধৌত করে পূজা করেন। মাল্যার্পণ করেন শ্রদ্ধার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। শ্রীঘোষকে গীতা, ফল, মিষ্টি, পরিধেয় বস্ত্র , নামাবলি ও মানপত্র শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে প্রদান করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন সাংবাদিক মিলন চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অচিন্ত্য কুমার সিংহ। শ্রীঘোষের কর্মজীবনের সঙ্গী সচ্চিদানন্দ তথ্য শ্রীঘোষের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। শ্রীঘোষের দুই পুত্রও তাঁদের পিতার জীবনের বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করেন। আরতি করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুজাতা বিষ্ণু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই তাঁর চরণে পুষ্প অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংবাদিক তথা বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। ঘোষ পরিবার সকলকে মধ্যাহ্নভোজনে আপ্যায়িত করে।

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

শ্রাবণ মাসের মাহাত্ম্য

কানু রঞ্জন দেবনাথ

শ্রাবণ মাসকে শিবের মাস বলা হয়। আমরা অনেকেই জানি যে ভারতীয় প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ পুরাণ থেকে আমাদের ঐতিহ্যের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে শ্রাবণ মাসে। ভগবান শিব বা ভোলানাথ বা মহাদেব মহেশ্বরের আরাধনা বা উপাসনা করার জন্য শ্রাবণ মাস খুব শুভ। এই মাস দেবাদিদেব শিবের প্রিয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পুরাণে বর্ণনা আছে যে শ্রাবণ মাসেই দেবতা ও অসুরদের মধ্যে সমুদ্র মন্থন হয়েছিল। সেই সমুদ্র মন্থনের ফলে সমুদ্রে যে বিষ উৎপন্ন হয়েছিল সেই বিষকে দেবাদিদেব মহাদেব নিজে পান করেছিলেন। বিষ পান করার ফলে তাঁর শরীর বা কণ্ঠ নীলবর্ণ হয়ে যায়। তাই তাঁকে 'নীলকণ্ঠ' বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া মহাদেব এই বিষ পান করে তিনি এই সৃষ্টিকে রক্ষা করেছিলেন। তা না হলে এই বিষের ফলে সমস্ত সৃষ্টি বা সমস্ত জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত। তাই তাঁকে বা শিবকে 'সৃষ্টি রক্ষা কর্তাও' বলা হয়ে থাকে। মনে করা হয় শ্রাবণ মাসে শিব-পার্বতী, উভয়েই মর্ত্যে নেমে এসে পৃথিবী ভ্রমণ করেন ও ভক্তদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে ভক্তদের আশীর্বাদ করেন।

বাংলা ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা অনুযায়ী বাংলা মাসের চতুর্থ মাসকেই শ্রাবণ মাস বলা হয়। শ্রাবণ মাসের সমাপ্তি মানে বর্ষাকালের সমাপ্তি। এরপরে শরতের আগমন। শ্রাবণ শব্দের উৎস হলো 'শ্রবণ' যার মানে হলো 'শোনা'। তাই এই শ্রাবণ মাস হলো শুভকথা বা ভালোকথা শ্রবণের বা শোনার মাস। কীর্তন, আরতি, ভজন শোনার মাস। শ্রাবণ মাস হলো মাসের মধ্যে সব থেকে পবিত্র মাস। এই মাসেই পূর্ণিমাতে শ্রবণা নক্ষত্রটি চাঁদের সহচার্যে থাকে বলে এই মাসের নাম শ্রাবণ মাস।

সোমবারকে মহাদেবের প্রিয় দিন হিসেবে মনে করা হয়। তাই ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের কাছে শ্রাবণ মাসের সোমবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র। শ্রাবণের যে কোনো সোমবারই শিব পূজার জন্য আদর্শ। শ্রাবণ মাসের প্রতিটি সোমবারের মাহাত্ম্য বেশি বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। এছাড়াও শ্রাবণ মাসের সোমবার সৌভাগ্য ও পুণ্য অর্জনের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। শিব মন্দির ছাড়াও শিবভক্ত হিন্দুদের বাড়িতে বাড়িতেও পুজো হয় শিবের। 'হর হর মহাদেব', 'বম বাবা ভোলেনাথ'-এর ধ্বনি সহ শিবভক্তদের ঢল নামে একটি ছোটো পাত্রে নদী থেকে জল নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে শিব মন্দিরে গিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালেন। তাই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে ভক্তরা কোনো ত্রুটি রাখেন না। উপবাস করে শিবের মাথা জল বা কাঁচা দুধও ঢালেন ভক্তরা। এই মাসে ভক্তিভাবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে শিবকে ডাকলে বা পুজো করলে তিনি তুষ্ট হন এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। বিবাহিত ও অবিবাহিত মহিলারা শ্রাবণ মাসের সোমবারে উপবাস রাখলে বিবাহিত মহিলাদের বিবাহিত জীবন এবং অবিবাহিত মহিলাদের বিবাহের পরের জীবন সুখের হয় বলে বিশ্বাস। তাছাড়া অনেক পুরুষও এই মাসে ব্রত পালন করেন এবং ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে ভগবান ভোলানাথের পুজো করেন। মনে করা হয় এই পুজো যারা করেন তাদের সুখ, সমৃদ্ধি বজায় থাকে এবং পাশাপাশি দাম্পত্য জীবনও মধু হয়। এই মাসে শিবস্তোত্র পাঠ ও রুদ্রাক্ষ মালা পরিধান করলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। যারা রুদ্রাক্ষ মালা পরিধান করতে চান তাঁরা এই মাসে পরিধান করলে বেশি উপকার পাবেন। ধুতুরা, আকন্দ, অপরাজিতা প্রভৃতি ফুল শিবের প্রিয় ফুল। তবে মহাদেব বেলপাতাতেই বেশি তুষ্ট হন।

শ্রাবণ মাসের মঙ্গলবারও খুব পুণ্যবার। শ্রাবণ মাসের মঙ্গলবারে মা পার্বতীকে বা মা গৌরীকে উৎসর্গ করা হয় মঙ্গল গৌরী ব্রত। মা মঙ্গলা গৌরী হলেন আদিশক্তি মাতা পার্বতীর মঙ্গলরূপ বা শুভ রূপ। তিনি মা দুর্গার অষ্টমরূপ মহাগৌরী নামেও পরিচিত। এই উপবাসের ফলে বিবাহিত জীবনে প্রেম বৃদ্ধি হয় এবং জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি আনে। যারা সন্তান লাভ করতে চান তাদের জন্যও এই পূজা খুব শুভ। দাম্পত্য জীবনে সমস্যা থাকলে মঙ্গল গৌরীর উপবাস করলে দাম্পত্য জীবন সুখী ও প্রেমময় হয়। এই মঙ্গল গৌরীর ব্রত উত্তর ভারতে বেশি প্রচলন আছে।

দীর্ঘ ১৯ বছর পরে এই বছরের শ্রাবণ মাসের ভাগ্যে জুটেছে মল মাস। চন্দ্র

পদ্ধতিতে মাসের গণনা করলেও সন গণনা করা হয় সৌর পদ্ধতিতে। হিন্দুধর্মের বা বৈদিক ধর্মের পূজা পার্বণ ও অন্যান্য যাবতীয় অনুষ্ঠানের সময় গণনা করা হয় চাঁদের পরিবর্তনের হিসেব অনুযায়ী। চন্দ্র পদ্ধতি অনুসারে এক বছরে থাকে ১২টি মাস, যার দিনসংখ্যা হলো ৩৫৫ দিন আর সৌর পদ্ধতিতে এ বছরের দিনসংখ্যা হয় ৩৬৫ দিন। তার মানে সৌর পদ্ধতি এবং চান্দ্র পদ্ধতির মাঝে এক বছরে থাকে ১০ দিনের পার্থক্য। এই কারণে তিন বছরে এই পার্থক্য গিয়ে দাঁড়ায় ৩০ দিন বা এক মাস। এই কারণে সৌর বছর ও চান্দ্র বছরের মেল বন্ধনের জন্য সাধারণত ৩ বছর পরে বা অন্তরে যে ৩০ দিন অধিক পাওয়া যায় তা হলো অধিক মাস বা পুরুষোত্তম মাস বা মল মাস। অনেক সময় এর হেরফের হয়ে থাকে। আবার কোনো এক মাসে যদি এমনটি দেখা যায় যে দুটি অমাবস্যা তিথি পড়েছে, তাহলে সেই মাসকেও মল মাস ধরা হয়ে থাকে। আবার যে মাসে সংক্রান্তি থাকে না সেই মাসকেও মলমাস বলা হয়ে থাকে। আবার যে মাসে একাদশী বেশি থাকে সেই মাসকেও মলমাস বলা হয়ে থাকে।

হিন্দু নববর্ষ, অর্থাৎ বিক্রম সংবৎ ২০৮০ এবার ১২-র পরিবর্তে ১৩ মাস হতে চলেছে। এবার অধিক মাস বা মল মাস শ্রাবণ মাসের পরে আসছে তাই এবার শ্রাবণ মাস ৩০ দিনের পরিবর্তে ৫৯ দিনের হবে। ২০২৩ সালে মানে এই বছরে শ্রাবণ মাসে ৪টি সোমবার নয়, ৮টি সোমবার পাওয়া যাবে। এই বছর শ্রাবণ মাস শুরু হয়েছে ৪ জুলাই থেকে এবং শেষ হবে ৩১ আগস্ট। এই দিন পূর্ণিমাও রয়েছে। ১৯ বছর পর এই অধিক মাস বা পুরুষোত্তম মাস বা মলমাস এবার শ্রাবণ মাসের ভাগ্যে পড়েছে। এবার হিন্দু পঞ্জিকার মতে বা বিক্রম সংবতের মতে শ্রাবণ মাস ৪ থেকে ১৭ জুলাই চলার পর ১৮ জুলাই থেকে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত মলমাস চলবে। মলমাস শেষ হবে অমাবস্যা রাতে। এরপর ১৭ আগস্ট থেকে ফের শ্রাবণ মাস শুরু হবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। এক কথায় ১৮ জুলাই থেকে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত শ্রাবণ মাসটাই হলো অধিক মাস বা মলমাস বা পুরুষোত্তম মাস।

অনেকেই বলে থাকেন যে মল মাস নাকি মলিন মাস বা অশুভ মাস বা খারাপ মাস। পুরাণ অনুসারে, একবার মলমাস এই দুঃখে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেলে ভগবান বিষ্ণু মল মাসের দুঃখ দেখে বললেন, আমার অপর নাম পুরুষোত্তম। আজ থেকে অধিক মাসও জগৎসংসারে 'পুরুষোত্তম মাস' নামে পরিচিত হবে। এই মাস সকল মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে। তখন বলেন যে মল মাস যদি খারাপ মাস বা অশুভ মাস হতো তাহলে এটা কীভাবে পুরুষোত্তম মাস হয়? ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই তো পুরুষোত্তম বলা হয়। যে মাস ভগবান কৃষ্ণের বা বিষ্ণুর মাস, সেই মাস কখনো অশুভ মাস হতেই পারে না। এবার শ্রাবণ মাস মলমাস পড়েছে। শ্রাবণ মাস আবার ভগবান শিবের মাস। তার মানে ভাবুন এবারের শ্রাবণ মাসের ভাগ্য কত ভালো। একে তো শিবের মাস তার উপর কৃষ্ণের মাস। মানে একাদশে বৃহস্পতি বা সোনায় সোহাগা। ভালোর উপরে আরও ভালো। অনেকেই এই মাসে কোনো ভালো কাজ করতে সন্দেহ করে। তারা মনে করেন মল মাসে কোনো ভালো কাজ করলে নাকি অশুভ হতে পারে।

আসলে এটা তাদের দোষ নয়। এটা দীর্ঘদিন বা দীর্ঘ বছর ধরে চলে আসা একটি ভ্রান্ত সংস্কার বা ধারণা। ছোটোবেলায় আমার মায়ের কাছে একটি কথা শুনেছি,--- 'মানুষকে বনের বাঘে খায় না, মানুষকে মনের বাঘে খায়।' সেরকম মনের মধ্যে সন্দেহ নিয়ে কোনো ভালো কাজ না করাই উচিত। মনের মধ্যে কোনো সন্দেহ না নিয়ে ভগবানের নাম নিয়ে কোনো ভালো কাজ শুরু করলে ভগবান অবশ্যই কাজে সফলতা দেবেন। মনে রাখতে হবে যে মাসের পালন কর্তা বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয় মাস (মল মাস বা অধিক মাস হিসেবে) এবং পাশাপাশি যে মাস (শ্রাবণ মাস মানে শিবের মাস) সৃষ্টি রক্ষা কর্তা শিবের নিজের মাস সেখানে আর কীসের ভয়?

তবে শ্রাবণ মাসে কিছু বিধিনিষেধ আছে— যেগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক। এই যেমন শ্রাবণ মাসে খাওয়াদাওয়ায় মন দিতে হয়। নেশাজাতীয় খাবার নিষেধ। মদ্যপান ইত্যাদি না করাই ভালো। তাছাড়া মাছ, মাংস, ডিম, পিঁয়াজ, রসুন না খেয়ে এই মাসে সাত্ত্বিক আহার বা নিরামিষ আহার করলে শরীর ভালো থাকে। কারণ এই মাসের আবহাওয়ার কারণে মানুষের শরীরের হজম শক্তির ক্ষমতা এমনিতেই কমে যায় বা হ্রাস পায়। তাছাড়া সর্দি, কাশির প্রকোপ লেগে থাকে। তাছাড়া এই মাসে প্রচুর বৃষ্টি হয় বলে চারিদিকে বা বাড়ির আশে পাশে নোংরা, আবর্জনা, বিভিন্ন ধরনের কীটাণু, ক্ষতিকর ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। ফলে ওইসব জায়গায় বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি থাকলে সেগুলিতে বিভিন্ন রকমের ক্ষতিকর ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধে। ফলে ওইসব শাকসবজি খেলে উপকারের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে শাকসবজি খেতে হলে গরম জলে ভালো করে ধুয়ে খেতে হবে এবং খুব কম খেতে হবে। তাই শ্রাবণ মাসে শাক খেতে নিষেধ করা হয়ে থাকে। এ ই বর্ষার সময় বেগুনগাছেও প্রচুর পোকামাকড় দেখা যায়। এই পোকা মাকড়কে মারতে ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই কীটনাশক বেগুনের সঙ্গে মানুষের পেটে গেলে প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই এই মাসে বেগুন খেতে নিষেধ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বাঁধাকপি, গাজর, বাসি জাতীয় খাবার না খেলেই ভালো।

শ্রাবণ মাসে নারিকেল খেলে খুব উপকার হয়ে থাকে। নারকেলে প্রোটিন, ম্যাংগানিজ, তামা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি থাকে যা শরীরে এই বর্ষর সময়ে খুব উপকারে লাগে। তাই অন্তত সপ্তাহে একদিন নারকেল খাওয়া উচিত। তাছাড়া সোমবারে উপবাসের দিন ডাবের জল খেলে খুব উপকার হয়ে থাকে। কারণ ডাবের জলে শরীরে জন্য উপকারী প্রচুর উপাদান বিদ্যমান থাকে। এটা হাইড্রেটিং, ডিটক্সিফাইং, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থে পূর্ণ। শ্রাবণ মাসে উচ্ছে বা করলা খেলে খুব উপকার পাওয়া যায়। এই আবহাওয়ায় উচ্ছে বা করলা খেলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। □

অসমীয়া জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ

শ্রীমন্ত শঙ্করদেব

ড. পূর্ণেন্দু শেখর দাস

অসমীয়া সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা ও বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক, অসমের ধর্ম, সমাজ, সুকুমার কলা ও সাহিত্য— এই সকল ক্ষেত্রে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের যে অম্লান প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায় তা অসমীয়া সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে।

১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে অসমের বরদোয়া নামক স্থানের নিকটবর্তী আলিপুখুরী গ্রামে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের জন্ম। পিতার নাম কুসুম্বর ভূঞা এবং মাতার নাম সত্যসন্ধ্যা। শৈশবকালেই পিতা-মাতার পরলোকগমন হয়। তাই ঠাকুরমা 'খেরসুতী'র তত্ত্বাবধানেই শঙ্করদেব লালিত পালিত হন। বারো বছর বয়সে পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলির টোলে তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয়। শৈশবকালেই তাঁর জীবনের কিছু লীলা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। টোলের শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি 'শিরোমণি ভূঁঞা' নামে খ্যাত হন। খুব কম বয়সেই বিভিন্ন দায়িত্বের অধিকারী হওয়ার সুবাদে তিনি 'ডেকাগিরী' নামেও বিখ্যাত ছিলেন।

১২০ বছর জীবনকালে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই অসমীয়া সমাজকে সঞ্জীবিত ও শক্তিশালী করে গেছেন। রচনারীতি অনুযায়ী শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের রচনাকে মূলত ছ'টি ভাগে ভাগ করা হয় যেমন— (১) অনুবাদমূলক : ভগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্দের অনুবাদ, উত্তরাখণ্ড রামায়ণ। (২) কাব্য : হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, রুক্মিণী হরণ, বলিছলন, অমৃতমন্থন, কুরুক্ষেত্র, অজামিল উপাখ্যান। (৩) অঙ্কীয়া নাট : পত্নীপ্রসাদ, কালিয় দমন, কেলিগোপিল, রুক্মিণী হরণ, পারিজাত হরণ, রাম বিজয়। (৪) গীত : বরগীত, ভটিমা। (৫) নাম-প্রসঙ্গ : কীর্তন, গুণমালা। (৬) ভক্তিতত্ত্ব : ভক্তিরত্নাকর, ভক্তি প্রদীপ।

কীর্তন হচ্ছে শঙ্করদেবের কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং অসমীয়া সাহিত্যের কীর্তিস্তম্ভ। অঙ্কীয়া নাটের মাধ্যমে শঙ্করদেব সৃষ্টি করেন অসমীয়া নাট্য সাহিত্যের। একাঙ্ক বিশিষ্ট এমন ধারার নাট সমূহ 'অঙ্কীয়া নাট' নামেই খ্যাত। এমন বৈশিষ্টের নাটসমূহকে শঙ্করদেব নিজে নাটক, অঙ্ক ও যাত্রা নামেও অভিহিত করেছেন। এই নাটসমূহের অভিনয়কে 'ভাওনা' নাম দিয়ে শঙ্করদেবই অসমে প্রথম নাট্যাভিনয়ের সূচনা করেন। অঙ্কীয়া নাটের মাধ্যমেই অসমীয়া সাহিত্যে গদ্য রচনার প্রবর্তন হয়। তাঁর বিরচিত নাটসমূহেতে তিনি সংস্কৃত অথবা কথিত ভাষার প্রয়োগ না করে ব্রজবুলি ভাষার প্রয়োগ করেছেন। ফলস্বরূপ, শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বিরচিত সাহিত্য হয়েছিল সর্বসাধারণের সহজবোধ্য, মিষ্টি ও সুরেলা।

শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের সমকালীন অসমে ধর্মের নামে চলছিল অধর্ম এবং সামাজিক জীবন ছিল বিশৃঙ্খল ও ব্যভিচারপূর্ণ। মানুষের মন ছিল সুস্থ সনাতন ধর্মের মার্গ থেকে অনেক দূরে। এমনই এক সামাজিক অস্থিরতাপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সমাজে প্রাচীন ভারতের সনাতন ধর্মের আদর্শ তুলে ধরতে সংকল্প নেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সরল উপায়ে ঈশ্বর সাধনার শিক্ষা দিতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করেন। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ অধ্যয়ন করে, নিজ দেশ, কাল ও পাত্রের উপযোগী করে শঙ্করদেব নববৈষ্ণব ধর্মের বীজ বপন করেন। বহু দেব-দেবীর পূজা বা বলি বিধানকে দূরে সরিয়ে একশরণ নামধর্মের প্রচার করেন। এই ধর্মের মূল বাণী হলো, 'এক দেব, এক সেব, এক বিনে নাহি কেহ'। এই ধর্মমতে ভগবান বিষ্ণুই একমাত্র পূজ্য দেবতা। শ্রীমন্ত শঙ্করদেবকে মহাপুরুষ হিসেবে গণ্য করে এবং এই ধর্মের মূলতত্ত্বের অধিকাংশ যেহেতু শ্রীমদ্ভগবত গীতা থেকেই গৃহীত, তাই অসমে বৈষ্ণব ধর্ম ক্রমে মহাপুরুষীয় ধর্ম এবং ভাগবতী ধর্ম হিসেবেও পরিচিত। অসমীয়া জাতীয় জীবনের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে আখ্যায়িত এই মহাপুরুষের ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে বৈকুণ্ঠপ্রয়াণ হয়।

মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের প্রিয়তম শিষ্য, অনুগত সেবক এবং প্রধান সঙ্গী শ্রীশ্রী মাধবদেব (১৪৮৯-১৫৯৬) ছিলেন শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের মতোই বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন। উপস্থিত বুদ্ধি, সংগঠন শক্তি, পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, গুরুসেবা, ভক্তি নিষ্ঠা ইত্যাদি সর্বগুণের অধিকারী হওয়ার সুবাদে তিনিই শঙ্করদেবের তিরোধানের পর ধর্মাধিকারী রূপে মনোনীত হয়েছিলেন। □

দশাবতার তাস

খেলার মধ্যেও ভারতীয় সংস্কৃতি

মরুতৃষা সরকার

চিত্রকলার এক অদ্ভুত নিদর্শন দশাবতার তাস। আমরা প্রায় সকলেই জানি পর্তুগিজরা আমাদের তাস খেলা শিখিয়েছিল। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। পর্তুগিজরা ভারতে আসার আগেও আমরা তাস খেলেছি। আমাদের শিল্পীরা আমাদের খেলার জন্য তাস তৈরি করেছেন। সেই তাস দশাবতার তাস। কবে প্রথম এই তাস তৈরি হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ঠিকই; তবে পর্তুগিজরা ভারতে আসার অনেক আগেই যে তৈরি হয়েছিল তা নিশ্চিত। এই বিষয়ে পণ্ডিতরা যেসব মত প্রকাশ

করেছেন তার অন্যতম একটি মত হলো, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীর হাম্বীর ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য লাভ করেন। রাজা বীর হাম্বীর ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হলেও বাদশা আকবরের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। তিনি প্রায়ই বাদশা আকবরের দরবারে যেতেন। সেই দরবারে তিনি তাস খেলা দেখেন। সেই তাস কেমন ছিল তা পরিষ্কার জানা যায়নি। তবে বীর হাম্বীর সেই তাস খেলা দেখে বেশ প্রভাবিত হন; এবং নিজের রাজ্যে সেই খেলা প্রচলন করেন। তবে তিনি যে তাস তৈরি করিয়েছিলেন তা তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। তাঁরই পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি হয় 'দশাবতার তাস'। এই তাস তৈরির প্রথম শিল্পী বিষ্ণুপুর নিবাসী কার্তিক ফৌজদার। তিনি বীর হাম্বীরের নির্দেশে 'দশাবতার তাস' তৈরি করেন। রাজার ঈশ্বরানুরাগ এই তাস নির্মাণের পরিকল্পনায় ফুটে ওঠে। তিনি মোগল দরবারে ব্যবহৃত তাসের অনুকরণে তাস তৈরি করতে পারতেন; কিন্তু করেননি। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন তাসের মাধ্যমেও মানুষ আমাদের ধর্মের অন্যতম প্রধান তত্ত্ব যে অবতারতত্ত্ব তা জানুক। সাধারণ মানুষ খেলার মাধ্যমে দশাবতারকে চিনুক।

তাস খেলা যে বঙ্গদেশে অনেক আগে প্রচলিত ছিল তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন। তাঁর মতে পালযুগে (৭৫০-১১৭৪ খ্রিঃ) বঙ্গদেশে তাস খেলা প্রচলিত ছিল। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের একটি ছোট্ট নোটে তিনি লিখেছিলেন— 'I fully believe that the game was invented about eleven or twelve hundred years before the present date.'

দশাবতার তাস তৈরির পদ্ধতি সহজ সরল হলেও সময় সাপেক্ষ। পুরানো সুতির কাপড় তেঁতুল বীজের আঠা দিয়ে কয়েক স্তরে জুড়ে নেওয়া হয়। শুকানোর পর স্তরে-স্তরে জোড়া কাপড়টি পিচবোর্ডের মতো শক্ত হয়ে যায়; আর বেশ কড়া হয়ে যায়। আঠা মাখানো কাপড়টিকে শুকিয়ে শক্ত ও কড়া করতে বেশ সময় লাগে। এবার সেই শক্ত কাপড় থেকে চার ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার তাস কেটে নেওয়া হয়। এবার সেই গোল গোল তাসগুলির উপর সাদা খড়ি মাটির প্রলেপ দিয়ে অঙ্কনের উপযুক্ত তৈরি করা হয়। অঙ্কনের জন্য ছাগলের লেজের লোম দিয়ে তৈরি তুলি ব্যবহার করা হয়। কারণ এই তুলির রং ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। এই তাসে মূলত প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করা হয়। যেমন— কালো রং তৈরি হয় কাঠকয়লা বা ভুসো কালি দিয়ে। হলুদ তৈরি হয় কাঁচা হলুদবাটা দিয়ে। সবুজ তৈরি হয় শিমপাতা দিয়ে। লাল ও সাদা রং তৈরি হয় পাহাড় থেকে আনা পাথর দিয়ে। লকেট ফল থেকে তৈরি হয় কমলা আর নীল রং হয় বাজার থেকে কেনা নীল বড়ি দিয়ে। অঙ্কন শৈলীতে লোকশিল্পের প্রভাব স্পষ্ট। রং খুব উজ্জ্বল ও পরস্পর বিরোধী। সূক্ষ্ম আলংকারিক রেখায় বস্ত্র ও অলংকারের নকশা অঙ্কিত হয়। আঁকা শেষ হয়ে গেলে, তাসগুলির পিছনে গালা কিংবা মেটে সিদুঁরের প্রলেপ দেওয়া হয়। খেলার সময় তাসগুলি যাতে ঘষে ঘষে নষ্ট না হয় তার জন্যে তাসের উপরে বার্নিশের একটি তরল প্রলেপ লাগানো হয়।

দশাবতার তাসে দশটি রং ব্যবহৃত হয়। এক একটি অবতারের জন্যে এক একটি রং নির্দিষ্ট থাকে। যেমন--- মৎস্যাবতারের তাসের রং কালো। কূর্মের কমলা, বরাহের সবুজ, নৃসিংহের ধূসর, বামনের নীল, পরশুরামের সাদা, রামের লাল, বলরামের হালকা-সবুজ, বুদ্ধের হলুদ আর কল্কির সিদুঁরে লাল। প্রতিটি অবতারের তাসের রং যেমন নির্দিষ্ট, তেমন প্রতীকও নির্দিষ্ট। মৎস্যাবতারের প্রতীক মাছ। কূর্মের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, বামনের কমণ্ডলু, পরশুরামের কুঠার, রামের বাণ, বলরামের গদা, বুদ্ধের পদ্ম আর কল্কির খড়্গ।

প্রতিটি রঙের তাসে ১২টি করে তাস থাকে। তাহলে তাসের মোট সংখ্যা— ১২×১০= ১২০টি। প্রতিটি রঙের তাসে সব থেকে বড়ো রাজা। তারপর মন্ত্রী। তারপর তাসগুলি ১ থেকে ১০ পর্যন্ত এক্কা, দোক্কা, চৌক্কা প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই তাসগুলিকে বলে ফোঁটা। প্রতিটি রঙের তাসে তার সংখ্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রতীক অঙ্কিত থাকে। যেমন— মৎস্যাবতারের তাসে এক্কায় আঁকা থাকে একটি মাছ। দোক্কায় দুটি, তেক্কায় তিনটি মাছ আঁকা থাকে। দশাবতার তাস সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য তাস খেলা হলেও এই তাসগুলির সৃষ্টিকর্মে যে নিপুণতা ও শিল্পবোধ রয়েছে তা আজও আমাদের বিস্মিত করে। বাঙ্গালির শিল্পকলার পরিচয় এরকম বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় অবলম্বল করে প্রকাশিত হয়েছে; যা বাঙ্গলা ও বাঙ্গালির সংস্কৃতিকে আজও ধরে রেখেছে।

এগুলি বাঙ্গলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। আমাদের উচিত যে কোনো মূল্যে এই শিল্প কর্মগুলিকে রক্ষা করা। কারণ সংস্কৃতির মাধ্যমেই একটি জাতির মানসিকতার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। □

স্বাধীনতা দিবসে কৃষ্ণ ষোলোকেও স্মরণে রাখতে হবে বাঙ্গালিকে

ছেচল্লিশের আক্রমণের 'অবশেষ' কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আজও পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায়, কলকাতার অঞ্চলে অঞ্চলে; এমনকী একেবারে সাম্প্রতিককালে ঘটা বাংলাদেশের নড়াইলে সেই আক্রমণের স্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ হয়ে চলেছে।

বিনয়ভূষণ দাশ

উনিশশো ছেচল্লিশে বঙ্গপ্রদেশকে টার্গেট করেছিল মুসলিম লিগ। দেশভাগকে নিশ্চিত করার জন্য জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ বঙ্গপ্রদেশকে তাঁর 'ব্যাটল গ্রাউন্ড' হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অর্থাৎ তাঁরা যখন দেখল ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর অবশ্যম্ভাবী এবং সেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে ভারতের দায়িত্বশীল নেতৃত্বের হাতে। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লিগ প্রমাদ গুনল। তারা বুঝতে পারল, দায়িত্বশীল নেতৃত্ব বলতে তখন কংগ্রেস নেতৃত্বকেই বোঝাত এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব বলতে হিন্দু নেতৃত্বকেই বোঝাত। লিগ নেতৃত্ব শুরু থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলন নয়, পাকিস্তান দাবি আদায়ের জন্য নানান কর্মসূচি অবলম্বন করেছিল। লিগ তাঁদের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণ করে। ফলে ব্রিটিশ শ্রমিক দলের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি যখন ব্রিটিশ সংসদে ৩০ জুন ১৯৪৮-এর মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন তখন লিগ নেতৃত্ব হতাশ হয়ে পড়ল। আর স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে সেখানে যে মুসলমানদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে না, অথবা প্রান্তিক ভূমিকামাত্র থাকবে

"DIRECT ACTION" DAY ASSAULTS

WIDESPREAD LOOTING & INCENDIARISM

FROM OUR CALCUTTA OFFICE

AUGUST 16.—STABBING, ARSON, LOOTING AND WILFUL DESTRUCTION ON A LARGE SCALE WERE WIDESPREAD IN CALCUTTA TODAY, WHICH HAD BEEN DECLARED "DIRECT ACTION DAY" BY THE MUSLIM LEAGUE.

Over 170 persons were killed and over 1,000 injured during the day, about 75 per cent of the latter having been admitted into six of the main hospitals in the city.

CURFEW was declared from 9 p.m. to 4 a.m., but in spite of this incidents continued throughout the night. Mobile police patrols toured the city throughout the day, dispersing crowds bent on mischief. Police are reported to have fired on a number of occasions, and about a dozen deaths in the hospitals were due to bullet wounds.

The Calcutta Fire Brigade worked at full pressure and dealt with more than 200 fires, large and small, under police protection. Many fires, especially in the bustee areas, could not be tackled as crowds prevented the Fire Brigade men from reaching them.

Apart from the damage caused by arson, the financial loss incurred by shopowners and private individuals through looting alone may total scores of lakhs.

Public transport services, including taxis, gharries and rickshaws were at a complete standstill, vehicular traffic on the roads being confined mainly to ambulances, police patrol vans and a few private cars.

ফ ও ৫

সেটা লিগ নেতারা অনুধাবন করতে পেরেছিল। এই অবস্থায় তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলন নয়, দেশভাগ ও পাকিস্তান আদায়ের জন্য নানা ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করতে লাগল। অন্য পথে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় না দেখে দাঙ্গাহাঙ্গামার পথে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে তাঁদের পাকিস্তান দাবি মানতে বাধ্য করার পথে এগোল।

অ্যাটলির ঘোষণার পরে তাঁরা দেখল, হাতে সময় নেই। ফলে তাঁরা দাঙ্গাহাঙ্গামার পথ বেছে নিল। ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ সুরঞ্জন দাশ তাঁর 'Communal Riots in Bengal, 1905-1947' বইতে লিখেছেন, 'Starting in August 1946 India suffered an unprecedented wave of communal violence for nearly a year. The form, extent and immediate cause of individual riots differed, but inflamed communal passion was a common factor, and the outbreaks were all intimately connected with developments in institutional politics centering on the Pakistan movement.' অধ্যাপক দাশ এই ধরনের সমস্ত দাঙ্গাকেই 'পার্টিশন রায়ট' বলে অভিহিত করেছেন। আর ছেচল্লিশের কলকাতা, নোয়াখালী ইত্যাদির হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও হত্যা সমস্ত বঙ্গপ্রদেশ তথা ভারতের ঘটনাক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করেছে পরবর্তীকালে।

১৯৪৬-এর ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁরা তদারকি মন্ত্রীসভায় যোগদান করবে না বলে কংগ্রেস ঘোষণা করে, কিন্তু তাঁরা 'সংবিধান সভায়' যোগদান করতে রাজি হয়। অন্যদিকে লিগ তদারকি মন্ত্রীসভা গঠনে ইচ্ছুক ছিল। এইরকম এক পটভূমিকায় ১০ জুলাই ১৯৪৬ জওহরলাল নেহরু মুম্বাইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, যদিও তাঁর দল সংবিধান সভায় যোগদান করবে, কিন্তু তাঁদের স্বাধীনতা থাকবে যে তাঁরা চাইলে ভবিষ্যতে ক্যাবিনেট মিশন প্লান বদলে দিতে বা সংশোধন করতে পারবে। জওহরলালের এই নির্বোধ মন্তব্যে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। এমনকী মৌলানা আজাদও জওহরলালের এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। কংগ্রেসের এহেন মতিগতিতে লিগ সন্দিহান হয়ে পড়ল। আর এর ফলে ক্রুদ্ধ জিন্না ২৯ জুলাই লিগের মুম্বাই অধিবেশনে ঘোষণা করল, তাঁরা ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করছে এবং পরিবর্তে তাঁরা ১৬ আগস্ট 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' বা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' হিসেবে পালন করবে। তাঁরা ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবও বাতিল করে দেয় ওই সম্মেলনে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে মুসলমানদের ভূমিকা কী হবে তাও মুসলমান জনতাকে বুঝিয়ে বলা হয়। তারা ঘোষণা করে, তারা সরকারের সঙ্গে সমস্ত সহযোগিতা বন্ধ করে দেবে এবং সমস্ত সাংবিধানিক পন্থা বর্জন করবে। জিন্না আরও ঘোষণা করে, এরপর থেকে তারা নানা সমস্যা সৃষ্টি করবে এবং শপথ গ্রহণ করে বলেন 'I will have India divided or India burned.'' এই সংগ্রামের অর্থাৎ ভারতকে জ্বালিয়ে দেবার Epicentre হিসেবে স্থির করা হয়েছিল কলকাতাকে। কিন্তু কেন? আমার পরিষ্কার মনে হয়, এর পেছনে লিগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও ক্রিয়াশীল ছিল। লিগের রাজনীতিতে জিন্না ছিলেন 'সুপ্রিম' নেতা। ধারে ও ভারে তাঁর সম পর্যায়ের কোনো নেতা লিগে ছিল না। কিন্তু বাঙ্গলার লিগ নেতা সুরাবর্দি মনে মনে নিজেকে জিন্নার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন।

ফলে কেন্দ্রীয় লিগ নেতৃত্বের কাছে নিজেকে প্রমাণ করার একটা দায় তাঁর ছিল। কলকাতা ছিল তাঁর রাজনীতির বিচরণক্ষেত্র, যদিও তাঁর বাড়ি মেদিনীপুর জেলায়। ফলে অনেক আগে থেকেই কলকাতায় নিজের শক্তি দেখানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বাঙ্গলার প্রিমিয়ার বা প্রধানমন্ত্রী। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, লিগের হয়ে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম নগরী কলকাতাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু তাঁর এই পরিকল্পনায় বাদ সাধে শহরের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তৎকালে কলকাতা শহরে হিন্দুদের শতকরা সংখ্যা ছিল ৭৫%, বাকি ২৫% মুসলমান। তাছাড়া যেহেতু কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তাই সুরাবর্দির পরিকল্পনা ছিল কলকাতা এবং সন্নিহিত জেলাগুলিকে হিন্দুদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করা। সেজন্য আগে থেকেই নানা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সুরাবর্দি। তাঁর লক্ষ্য ছিল এক বীভৎস দাঙ্গা সংগঠিত করে কলকাতা শহরের হিন্দুর সংখ্যা কমানো। একদিকে দাঙ্গায় তাঁদের হত্যা করা; অন্যদিকে দাঙ্গার বীভৎসতার ভয়েও হিন্দুরা পলায়ন করবে অন্যত্র। দাঙ্গা সফল করার জন্য আগে থেকেই কলকাতার বিভিন্ন থানার হিন্দু পুলিশ অফিসারদের অন্যত্র সরিয়ে মুসলমান অফিসারদের সেই সমস্ত থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আগে কলকাতা ও বাঙ্গলার পুলিশ নিয়োগ হতো মূলত উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ভোজপুর অঞ্চলের আরা, বালিয়া, ছাপরা, দেওরিয়া ইত্যাদি জেলা থেকে। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর চরম নির্যাতন চালানো আই সি এস পুলিশ অফিসার নিয়াজ মহম্মদ খাঁকে সুরাবর্দি নির্দেশ দিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের নিষ্ঠুর ও নির্মম পঞ্জাবি মুসলমান ও পাঠানদের পুলিশে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ছেচল্লিশের আগস্টে টানা তিনদিন ধরে তৎকালীন বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দির আমলে তাঁরই নেতৃত্বে হিন্দুদের উপর চলে লুট, নরহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন। কেউ কেউ এই নরসংহার পর্বকে কুখ্যাত 'দীর্ঘ ছুরিকার সপ্তাহ' বলে অভিহিত করেছেন। আর কলকাতার The Statesman পত্রিকা দাঙ্গার চারদিন পরে তাঁদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মহা নরসংহারকে The Great Calcutta Killings বলে অভিহিত করে। মুসলিম লিগের মস্তান আর গুন্ডাদের তাণ্ডবে প্রাণ হারায় সরকারি হিসেবমত প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি। বেসরকারি হিসেবে ৪০,০০০ থেকে ১,১০,০০০। হাজার হাজার মানুষ নিগৃহীত হয়েছিল। আর এক লক্ষ কুড়ি হাজারের বেশি মানুষ গৃহহীন হয়েছিল। আর কলকাতার এই মহাদাঙ্গার কুখ্যাত নায়ক ছিলেন মুসলিম লিগে জিন্নার সহকর্মী তথা নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী সুরাবর্দি সাহেব।

কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরে মার্ক্সবাদী, নেহরুপন্থী এবং মুসলিম লেখক ও ঐতিহাসিকেরা সুরাবর্দির

এই ঘৃণ্য অপরাধকে 'শ্বেতরঙে চুনকাম' করে তাকে এক সম্মাননীয় নায়কে পরিণত করেছে। কিছু বামপন্থী ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবের মতোই জিন্নাকেও সহনশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে চিত্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন কিন্তু কলকাতার দাঙ্গা তাঁকে কট্টর ইসলামপন্থী হিসেবে প্রতিভাত করেছে। জিন্না জেনেবুঝেই ১৬ আগস্টকে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' হিসেবে ঘোষণা করেছিল। কারণ ওই দিনের সঙ্গে ইসলামের তথাকথিত বিজয়ের সম্পর্ক ছিল। ১৯৪৬-এর ওই দিন ছিল রমজান মাসের অষ্টাদশ দিন এবং ওই দিনই হজরত মহম্মদ 'বদরের রক্তাক্ত যুদ্ধ' শুরু করেছিলেন অমুসলিম 'হিদেন'দের বিরুদ্ধে। বাঙ্গলায় জিন্নার শাগরেদ সুরাবর্দি ও তাঁর সঙ্গীরা বদরের যুদ্ধজয়ের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে উত্তেজক বক্তৃতা করতে লাগলেন কলকাতা জুড়ে। মুসলিম লিগের মুখপত্র 'The Star of India'-র ১৩ আগস্ট সংখ্যায় কীভাবে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালন করতে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রকাশিত হলো।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, সুরাবর্দি ও জিন্নারা ১৬ আগস্ট দিনটিকে পুরোপুরি একটা 'জেহাদ' বা 'ধর্মযুদ্ধের' চেহারা দিতে সচেষ্ট ছিল শুরু থেকেই। মসজিদের ইমামরা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে' কলকাতার হিন্দুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ হিসেবেই গ্রহণ করেছিল এবং সেইভাবেই বিষয়টি প্রচার করেছিল। ঐতিহাসিক প্যাট্রিক ফ্রেঞ্চ তাঁর পুস্তক Liberty of Death : India's Journey to Independence & Division গ্রন্থে লিখেছেন, ''H. S. Surahwardy ran the Bengal League and his organisation had entrusted direct action to Calcutta's pirs and mullahs, who were told to mobilise the Muslim community at Friday prayers.'' ঐতিহাসিক যূথিকা রায়ের মতে, জিন্না কলকাতার ব্যাপারে সুরাবর্দিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন হিন্দুদের সন্ত্রস্ত করা ও দাঙ্গা চালানোর ব্যাপারে। অধ্যাপক অমরনাথ বালি তাঁর Now it can be told নামক দেশভাগের ঘটনাবলী নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থে বলেছেন, 'Mr. Suhrawardy is one of those Muslim League leaders on whom fell the choice of inaugurating the first battle of Pakistan in Calcutta. His 'Direct Action Programme Day' one the 16th of August, 1946 unfolded for the first time the pattern of the war which the Muslim League wanted to wage against Hindus and Sikhs for the attainment of their objective.'

সমস্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সুরাবর্দি হিংসা ও দাঙ্গায় বিশ্বাস করতেন এবং এজন্য সে এক বিশাল গুন্ডাবাহিনীর পৃষ্টপোষকতা করত। তাছাড়াও সে অতীব দুর্নীতিগ্রস্ত ও শাসন পরিচালনায় অপদার্থ ছিল। এছাড়া তাঁর 'দিনলিপি' থেকে পাওয়া যায়, সে অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিল এবং গোটা ভারতীয় উপমহাদেশকে ইসলামি দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখত। আর তরবারি হাতে জিন্নার ছবিযুক্ত পোস্টার কলকাতার বিভিন্ন মহল্লায় বিলি করা হয়েছিল। তৎকালীন কলকাতার মেয়র সৈয়দ মহম্মদ উসমান একটা লিফলেট সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিল যাতে ঘোষণা করা হয়েছিল, 'কাফের!', তোদের ধ্বংসের আর বাকি নাই, আর তোদের সার্বিক হত্যাকাণ্ড ঘটবে!

''বাঙ্গলাকে কাফের মুক্ত করার আহ্বানও জানানো হয়েছিল। তবে এটা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের এই ঘোষণা সরকার, পুলিশ বা ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে ছিল না, এটা ছিল একান্তভাবেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে। এই দাঙ্গার প্রস্তুতিপর্বে আগস্ট ৫ ইংরেজি স্টেটসম্যান পত্রিকায় সুরাবর্দি 'শাহিদ' ছদ্মনামে এক প্রবন্ধে লেখেন, ''দাঙ্গাহাঙ্গামা এমনিতে খারাপ, কিন্তু তা যদি কোনো মহান আদর্শে করা হয় তাহলে সেটা অন্যায় নয়। আর এই মুহূর্তে মুসলমানদের কাছে পাকিস্তান দাবি আদায় করা এক পবিত্র কর্তব্য। মুসলমানদের হাতে তরবারি আছে, তা ব্যবহার করাই মুসলমানদের কাছে পবিত্র কর্তব্য। এদিকে জিন্নার ১৬ আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ঘোষণার ফলে বাঙ্গলার তৎকালীন প্রধান সচিব আরএল ওয়াকারের পরামর্শে এবং সুরাবর্দির অনুরোধে বাঙ্গলার ব্রিটিশ গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ ওই দিনটিকে ছুটির দিন ঘোষণা করে। বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতৃত্ব এই সর্বজনীন ছুটি ঘোষণার বিরোধিতা করে। তাঁদের মতে, ছুটির ফলে লিগের গুন্ডারা জোরজবরদস্তি সবাইকে হরতাল পালনে বাধ্য করবে। বাঙ্গলার বিধানসভার কংগ্রেসের দলীয় নেতা কিরণশঙ্কর রায় ১৪ আগস্ট এক বার্তায় হিন্দু ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের হরতাল পালন না করে দোকান, ব্যবসা ইত্যাদি খোলা রাখার অনুরোধ করেন।

লিগের পূর্বপ্রস্তুতি মতো ১৬ আগস্ট জুম্মার নামাজের পরে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, মেরিয়াবুরুজ, ২৪ পরগনা ইত্যাদি বিভিন্ন মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে মুসলমানরা কলকাতার অক্টারলোনি মনুমেন্টের পাদদেশে সমবেত হয়। মুসলিম লিগের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী তথা লিগ নেতা সুরাবর্দি। অন্যান্য লিগ নেতৃবৃন্দ যেমন আবুল হাসেম, নিজামুদ্দিন, মেয়র উসমান এঁরাও উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুও প্রথম দিকে কিছুক্ষণ এই সভায় ছিলেন, পরে অবস্থা বেগতিক দেখে 'যঃ পলায়তি, স জীবতি' নীতি অনুসরণ করে পালিয়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীঅমিতাভ ঘোষ লিখেছেন (আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষের পুত্র), The maidan meeting was attended by Jyoti Basu the leader of the Communist Party of India which supported the creation of Pakistan. He ran away when the situation tended to go out of control.

সভার প্রত্যেক বক্তাই উপস্থিত সশস্ত্র জেহাদি জনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য উত্তেজক বক্তৃতা দেন। যদিও গণ্ডগোল শুরু হয় এই সভার অনেক আগেই। উপস্থিত জেহাদি জনতার সংখ্যা আই বি রিপোর্ট অনুযায়ী ত্রিশ হাজার, কলকাতা পুলিশের এক ইন্সপেক্টরের রিপোর্টের হিসেবে পাঁচ লক্ষ আর লিগ মুখপাত্র 'সি স্টার অফ ইন্ডিয়ার' হিসেব অনুযায়ী এক লক্ষ। সুরাবর্দির ভাষণে গণ্ডগোল চলাকালে পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনীকে ব্যারাকে আটকে রাখার কথা বলা হয়েছিল। বাস্তবেও ঘটেছিল সেটাই। সেন্ট্রাল

ইন্টেলিজেন্সের ফ্রেডারিক বারোজের কাছে পাঠানো এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ''He had been able to restrain the military and the police.'' তাঁর এই কথার বাস্তবায়ন করতেই সুরাবর্দি পরে কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টার লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের অফিসে বসে লাগামছাড়া এই দাঙ্গার নেতৃত্বদান করে। সভা শেষ হবার পরেই সমস্ত উত্তর ও মধ্য কলকাতা সশস্ত্র জেহাদি গুন্ডাদের হাতে চলে যায়। এই আক্রমণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এই দাঙ্গায় সম্প্রতি শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি হিসেবে নির্বাচিত শেখ মুজিবুর রহমানের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

মুজিবুর তখন ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ) এবং বেকার হস্টেলের আবাসিক। সুরাবর্দির ডান হাত মুজিবুর তখন মুসলিম লিগের ছাত্র শাখার সম্পাদক ও জঙ্গিনেতা। বাম ঐতিহাসিকেরা অবশ্য মুজিবুরের রক্তাক্ত হাত ধুইয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। তালতলা ও ওয়েলিংটন স্কোয়ার অঞ্চলে ছোরা হাতে তিনিই নেতৃত্ব দেন। অথচ মুজিবুর রহমান তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে' সম্পূর্ণ মিথ্যা লিখেছেন, ''হাশিম সাহেব আমাদের নিয়ে সভা করলেন। আমাদের বললেন, 'তোমাদের মহল্লায় মহল্লায় যেতে হবে, হিন্দু মহল্লায়ও তোমরা যাবে। তোমরা বলবে, আমাদের এই সংগ্রাম হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, আসুন আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দিনটি পালন করি।' 'পাকিস্তান' আমাদের দাবি, এই দাবি হিন্দুর বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের প্রোপাগান্ডার কাছে তারা টিকতে পারল না। হিন্দু সমাজকে বুঝিয়ে দিল এটা হিন্দুদের বিরুদ্ধে।

উপরে বর্ণিত লিগের অন্যান্য নেতৃত্বের বক্তব্য কিন্তু মুজিবের এই বক্তব্যকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছে। তিনি সমস্ত দোষটাই কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার উপর চাপিয়ে দিলেন; দায় থেকে লিগকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলেন। একইভাবে মিজানুর রহমান তাঁর 'কৃষ্ণ যোলোই' গ্রন্থে দাঙ্গাতে মুসলিম লিগের দায় বেশিরভাগটাই হালকা করে দিয়েছেন এবং পাকেপ্রকারে হিন্দুদেরই বেশি দায়ী করেছেন। যদিও ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় লেখক মাত্রই বালক, স্কুলের ছাত্র। তাঁর পক্ষে বিস্ফোরিত নেত্রে, প্রাণের ভয় ত্যাগ করে দাঙ্গার খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয় কোনোমতেই। বরং তাঁর পক্ষে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক, বালকোচিত। ব্রিটিশ সেনানী লেফটেন্যান্ট জেনারেল Francis Tuker তাঁর 'While Memory Serves' গ্রন্থে দাঙ্গার একটি বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন; কিন্তু তাঁরও টান যেন মুসলমানদের দিকেই বেশি। তিনি তাঁর ওই গ্রন্থে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসকে সমানভাবে দায়ী করেছেন, লিখেছেন, For the first half of August, speeches of public men of both Congress and Muslim League at large meetings in Calcutta were inflammatory and violent in their character, all directed against the opposite community. অবশ্য ব্রিটিশ আধিকারিকদের টান বরাবরই মুসলমানদের দিকে বেশি; সেই উইলিয়াম উইলসন হান্টার থেকে।

প্রথম দিনের পরে দাঙ্গার গতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলে গেলে সে নিজের মসনদ বাঁচাতে এবং হিংসা থামাতে দুই মস্তান তথা মুসলিম লিগ ও মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের নেতা জি জি আজমেরি এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে পরবর্তীকালে যে সন্ধির জন্য গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাঠান। গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে তাঁরা হত্যাকাণ্ড থামাতে অনুরোধ জানান। গোপাল মুখোপাধ্যায় শর্ত দেন, প্রথমে মুসলিম লিগকে 'কিলিং স্কোয়াডকে' নিরস্ত্র করতে হবে এবং হিন্দুদের উপর আক্রমণ থামাতে হবে। নিরুপায় সুরাবর্দি দুটি শর্তই মেনে নেয়। এদিকে ২১ আগস্ট গভর্নর জেনারেল ওয়াভেল অপদার্থতার দায়ে তাঁর সরকার বরখাস্ত করে দেয়। এইভাবে সমাপ্ত হয় সুরাবর্দির সাম্প্রদায়িক, অপদার্থ মুসলিম লিগের সরকার।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি থেকে একটা বিষয় নিশ্চিতরূপেই প্রমাণিত যে, এই আক্রমণ মুসলিম লিগ এবং তার নেতা সুরাবর্দির পূর্বপরিকল্পিত; দীর্ঘদিন আগে থেকেই হিন্দুদের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় আরও একটি বিষয় হলো, 'বাপু' গান্ধী আর জওহরলাল কলকাতা এসে দাঙ্গাবিধ্বস্ত নাগরিকদের দুর্দশা দেখার সময়ই পেলেন না। ইসলামি সম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে ফ্রান্সিস টুকের তাঁর পূর্বোক্ত ওই বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন, One great reality of Indian politics has for years been communalism. But unfortunately the Congress Party hid it from the world, with the inevitable result that India today is decisively parted into at least two nations. অর্থাৎ ভারতীয় রাজনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব হলো সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু দুভাগ্যবশত কংগ্রেস দল এই সত্য সমগ্র পৃথিবীর কাছ থেকে লুকিয়ে ছিল যার অবধারিত ফল হলো ভারতের নিশ্চিতরূপে কমপক্ষে দুটি জাতিতে বিভক্ত হওয়া। কংগ্রেসের ভূমিকা সম্পর্কে এরচেয়ে সত্যভাষণ আর কিছু হতে পারে না।

ছেচল্লিশের আক্রমণের 'অবশেষ' কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আজও পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায়, কলকাতার অঞ্চলে অঞ্চলে; এমনকী একেবারে সাম্প্রতিককালে ঘটা বাংলাদেশের নড়াইলে সেই আক্রমণের স্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ হয়ে চলেছে। একই স্ফুলিঙ্গের উদ্গীরণ হয়ে চলেছে মণিপুরে, হরিয়ানায়। তাই ওই দাঙ্গার স্মৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে হিন্দুরা সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ হলেই ভবিষ্যতে আক্রমণের অশনি থেকে রক্ষা পেতে পারে; নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে।

(১৯৪৬-এ কলকাতার 'নরসংহার'কে স্মরণ করে প্রকাশিত)

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

অনুর্বর জমিতে বাগান তৈরির দৃষ্টান্ত স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ঝাড়খণ্ড সীমানা লাগোয়া বিহারের বাঁকা জেলার সাঙ্গা পঞ্চায়েত এলাকার একটি গ্রাম তেলিয়া কুরা। এই গ্রামের কৃষক ৫২ বছর বয়সি মেঘলাল যাদব ওই অঞ্চলের কৃষক সমাজের প্রেরণার উৎস। ১৯৯১ সালে ৩ একর অনুর্বর জমিতে টম্যাটো চাষের মাধ্যমে তাঁর যাত্রা শুরু। ২০০-৪০০ টাকা মূল্যের টম্যাটো বীজ কিনে টম্যাটো চাষ করে ২০-২৫ হাজার টাকা মূল্যের ফসল উৎপাদন করেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর এই উপার্জন বাড়তে থাকে। বিগত ৩২ বছরের কঠোর পরিশ্রমে তিনি নার্সারি-সহ তাঁর এই ফল বাগান ও সবজি চাষের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করেছেন যা এতদ্‌অঞ্চলের কৃষকদের স্বরোজগার ও আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে উৎসাহিত করে।

স্কুলের পড়াশোনা শেষ হলে এই আর্থিক অভাব-অনটন থেকে মুক্তি লাভের লক্ষ্যে তাঁর মনে এক তীব্র ইচ্ছার জন্ম হয়। ফারুখাবাদের এক কোম্পানির প্রকাশিত একটি বই পড়ে তিনি কৃষিকাজ করবেন বলে মনস্থির করলেন। এর জন্যে তিনি ওয়ার্ল্ড ভিশন সংস্থা নামের একটি বেসরকারি সংগঠন থেকে কৃষি প্রযুক্তি কৌশলের প্রশিক্ষণ নিলেন। তারপর তাঁর অনুর্বর জমিতে কৃষিকাজে হাত দিলেন। কৃষিজমিতে জলসেচের জন্য পুকুর খনন করলেন। তার সঙ্গে বোরিং বা গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করলেন। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগের বদলে গোবর-গোমূত্র দিয়ে প্রস্তুত জৈব সার ও কীটনিয়ন্ত্রক প্রয়োগ করলেন। এই কাজে তাঁর স্ত্রী নির্মলা দেবীও সম্পূর্ণ সহযোগিতা করলেন। বর্তমানে মেঘলালজী ৮-৯ একর জমিতে নার্সারি ও বাগান করছেন যা 'নির্মলা দিদি বাগবানী' নামে নামে পরিচিতি লাভ করেছে। মেঘলালজী তাঁর উৎপাদিত ফসল প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের সীমান্ত অঞ্চলের বাজারগুলিতে বিক্রি করে প্রতি বছর ৪-৫ লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন। তিনি বলেন যে যখন এই কৃষিকাজ তিনি শুরু করলেন, তখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে শুরু করে অর্থাভাব-বিভিন্ন সময়ে এইরকম বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন তিনি হয়েছেন। কিন্তু না তিনি তাঁর সাহস, উদ্যম হারিয়েছেন, না তিনি কঠোর পরিশ্রমের পথ থেকে সরে এসেছেন।

আজ বাঁকা জেলা ছাড়াও অন্য দূর-দূরান্ত এলাকার সমগ্র কৃষক সমাজে তিনি একজন সফল ও সম্পন্ন কৃষকের সম্মান অর্জন করেছেন। তাঁর তৈরি নার্সারিতে সেগুন, বীচউড, মেহগনি, আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, করলা, ঢ্যাঁড়শ, কুমড়ো, পেঁপে ইত্যাদির চারা উৎপন্ন হয় এবং বনদপ্তরও এখন এই সকল চারার ক্রেতা। এগুলি ছাড়া ধান, গম, ভুট্টা, লঙ্কা, পেঁয়াজ ও অন্যান্য ফসলের চাষও তাঁর ক্ষেতে হয়। জেলা ও রাজ্য স্তরে তিনি ইতিমধ্যেই 'কৃষিশ্রী' পুরস্কার লাভ করেছেন। ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত তিনি নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন। তাঁর তৈরি ফলের বাগানে উৎপন্ন রেড লেডি বা লাল পরি ভ্যারাইটির ৪ কিলোগ্রাম ওজনের পেঁপে পাটনার কৃষি প্রদর্শনী ও বাঁকায় আয়োজিত কৃষিমেলাতে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে।

কৃষক জীবনের এই উপলব্ধি বর্ণনা করে তিনি বলেন যে গ্রামাঞ্চলে এই সবুজায়ন মিশনের দ্বারা বৃক্ষরোপণের অভিযান তিনি শুরু করেছেন, যার মাধ্যমে গ্রামীণ স্বরোজগার ও আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে সশক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভবপর হয়েছে। জৈব কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। ৩ একর অনুর্বর জমিতে চাষ শুরু করে আজ ৮-৯ একর জমিতে নার্সারি, ফলের বাগান-সহ ফসলের ক্ষেত যার ফলশ্রুতি। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির কৃষকরা তার থেকে কৃষিকাজ ও উদ্যানপালনের প্রযুক্তি-প্রকৌশলের প্রশিক্ষণ নিতেও তাঁর কাছে প্রতিনিয়ত আসেন। জৈব কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগে অনুর্বর জমিতে ফসল ফলিয়ে এই প্রজন্মের কৃষিকাজে আগ্রহী সবার সামনে আত্মনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে মেঘলাল যাদব আজ এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। □

অবিচল ধৈর্য

একবার দেবর্ষি নারদ পৃথিবীতে ঘুরতে এলেন। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন একটি গাছের তলায় এক

তপস্বী ভগবানের নাম জপ করে চলেছেন। নারদকে দেখতেই উঠে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রাণাম করে বললেন, দেবর্ষি, আপনি কোথা থেকে আসছেন আর যাবেনই-বা কোথায়?

দেবর্ষি বললেন, আমি মর্ত্যলোকে ঘুরতে এসেছিলাম, এখন আবার প্রভুকে দর্শন করতে বিষ্ণুলোকে যাচ্ছি। একথা শুনে তপস্বীর মুখমণ্ডল খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দেবর্ষিকে জিজ্ঞেস করলেন, মুনিবর, এরপর যখন আপনি আবার মর্ত্যলোকে আসবেন তখন প্রভুকে জিজ্ঞেস করে জেনে আসবেন যে আমাকে তিনি কবে দর্শন দেবেন? দেবর্ষি বললেন, ঠিক আছে বন্ধু, এর পরে যখন আসব তখন তোমার কথা প্রভুকে জিজ্ঞেস করে আসব।

নারদ প্রভুর নাম গাইতে গাইতে বিষ্ণুলোকে চলে গেলেন। বিষ্ণুকে প্রণাম করে নারদজী সেই তপস্বীর কথা বললেন। ভগবান বিষ্ণু বললেন, ভক্ত নারদ! এখনো তার লক্ষ জন্ম বাকি আছে। সেটা শেষ হলেই আমি তাকে দর্শন দেব।

আবার বহুদিন পর দেবর্ষি নারদ মর্ত্যলোকে এলেন। তপস্বীর সঙ্গে দেখা করে বললেন, ভগবান বিষ্ণু কয়েক লক্ষ জন্ম পরে তোমাকে দর্শন দেবেন। তারপর দেবর্ষি চলে গেলেন।

তপস্বী একথা শুনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। ভগবান একদিন না একদিন দেখা দেবেন, তাই উৎসাহিত হয়ে দ্বিগুণ উদ্যমে ভগবানের নাম জপ করতে লেগে গেলেন। বৈকুণ্ঠে বসেই ভগবান তার অবিচল ধৈর্য ও বিশ্বাস দেখে খুবই প্রসন্ন হয়ে গেলেন। আর তখনই তার সামনে প্রকট হয়ে তাকে দর্শন দিলেন আর বর দিতে চাইলেন। তপস্বী সুখভোগের কিছুই না চেয়ে বললে, আপনার চরণে যেন আমার অটুট ভক্তি থাকে।

এদিকে তিনদিন পর দেবর্ষি ওই রাস্তায় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ফিরছিলেন। দেখলেন, খুব প্রসন্নমুদ্রায় তপস্বী ভগবানের নাম জপ করে চলেছে। দেবর্ষি নারদ অবাক হয়ে তার কাছে গিয়ে বললেন, কী ভাই, এত খুশি কেন? একজন ভক্তের কাছে ভগবানের দর্শনলাভই আনন্দের বিষয়, আর তোমার তো আরও লক্ষ জন্ম লাগবে। তবু এত খুশি?

দেবষির কথা শুনে তপস্বী একটু হেসে বললেন, না ঋষিবর, আপনার চলে যাবার পরই প্রভু আমাকে দর্শন দিয়েছেন। আর অখণ্ড ভক্তির বর দিয়েছেন। এই কথা শুনে দেবর্ষি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি সোজা বিষ্ণুলোকে গিয়ে ভগবানকে অভিযোগ করলেন, কেন প্রভু, আপনি তো আমাকে বলেছিলেন, আরও লক্ষ জন্ম পর ওই তপস্বীকে দর্শন দেবেন, আর একদিন পরেই তাকে দর্শন দিয়ে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করলেন? কেন প্রভু, কেন এমন করলেন?

ভগবান বিষ্ণু হাসতে হাসতে বললেন, ভক্ত নারদ! আমার দর্শন কোনো দেশ, কাল, পরিস্থিতি অনুসারে হয় না। আমার দর্শন শুধু মনে শুদ্ধ ভক্তি থাকলেই হয়। যার অসীম ধৈর্য আর অটুট বিশ্বাস থাকে, আমি সর্বদা তার কাছেই থাকি। যার ধৈর্য নেই, বিশ্বাস নেই, সবসময় চঞ্চল থাকে, তাকে দর্শন দিতে আমি দেরি করি বা জন্মজন্মান্তরেও তারা আমার দর্শন পায় না। ওই তপস্বীর প্রশ্নে তাকে আমার অধৈর্য মনে হয়েছিল, সেজন্যে আমি আরও লক্ষ জন্মের কথা বলেছিলাম। কিন্তু লক্ষ জন্মের কথা শুনেও কোনো না কোনোদিন আমার দর্শন পাবে জেনে খুশি মনে আবার সাধনায় মগ্ন হওয়ায় তার অসীম ধৈর্যের পরিচয় পেয়ে আমি তৎক্ষণাৎ তাকে দর্শন দিয়েছি।

ভক্ত নারদ! জেনে রাখো, ধৈর্যশীল ও বিশ্বাসীরাই শুধু আমার দর্শন পায়।

তুষার কর

বীর বনবাসী

য়ু কিয়ংগ নাংগবা

য়ু কিয়ংগ নাংগবা মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া জনজাতির স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মেঘালয়ে ইংরেজ শাসন ছিল না। ১৮৩৫ সালে ইংরেজরা বিভেদ নীতি প্রাযোগ করে জয়ন্তী পাহাড়কে দুই ভাগে ভাগ করে এবং জনজাতিদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করে। এই পরিস্থিতিতে জনজাতি সমাজ য়ু কিয়ংগ নাংগবাকে নেতা স্বীকার করলে তিনি জনজাতি যুবকদের নিয়ে সেনা গঠন করেন। তারা লোগকীতি গেয়ে তির-ধনুক, লাঠি, বল্লম নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জনজাগরণ করতেন। ২০ মাস ধরে তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছেন। এক সময় তাঁরই এক সঙ্গীর বিশ্বাসঘাতকতায় কিয়ংগ নাংগবা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন। ১৮৬২ সালের ৩৯ ডিসেম্বর পশ্চিম জয়ন্তিয়া পাহাড়ে জোবাই শহরে ব্রিটিশ শাসক প্রকাশ্যে তাঁকে ফাঁসি দেয়।

জানো কি?

- আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম দেশ ভারত।
- জাতীয় গণিত দিবস পালিত হয় ২২ ডিসেম্বরে।
- ভারতবর্ষ থেকে প্রথম খণ্ডিত হয় আফগানিস্তান।
- তামিলনাড়ু রাজ্যকে মন্দিরের পবিত্র ভূমি বলা হয়।
- কর্ণাটক রাজ্য চন্দনকাঠের জন্য বিখ্যাত।
- ভারত, বাংলাদেশ ছাড়া আফ্রিকার সিয়েরা লিওন দেশের সরকারি ভাষা বাংলা।
- ভারতে ন'টি পিন কোড জোন রয়েছে।

ভালো কথা

সমাজ সেবিকা

কলকাতা লেক গার্ডেনের কাছে গোবিন্দপুরের শাশ্বতীদিদিকে এলাকার সবাই এক ডাকে চেনে। তিনি সমাজ সেবিকা। গরিব মানুষের সেবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব থাকেন। সারাদিন তিনি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে খোঁজখবর নেন, কার কী প্রয়োজন। তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেন তাঁর এক বান্ধবী। নিজেই পরিশ্রম করে টাকা জোগাড় করে তিনি মানুষের সেবা করেন। তিনি সাংবাদিকতাও করেন। প্রেস ক্লাবের বড়ো পদেও আছেন। গরিব মানুষের জন্য তাঁর মন সবসময় কাঁদে। রাস্তার গরিব দুঃখী মানুষকে তিনি খেতে দেন, বাচ্চাদের জামাকাপড় দেন। তাঁর কাজকে সম্মান জানিয়ে ম্যাজিক বুক অব রেকর্ড তাঁকে নারীশক্তি সম্মানে ভূষিত করেছে। আমি শাশ্বতী দিদিকে সেবিকাদিদি বলি।

সুজাতা দে, একাদশশ্রেণী, লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৪৫।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

বক

ঐন্দ্রি মহান্ত, দ্বিতীয়শ্রেণী, নুড়াইপাড়া, সিউড়ী, বীরভূম।

লম্বা গলা লম্বা পায়ে
দাঁড়িয়ে থাকিস আজও
ধ্যান করা আর মাছধরা ছাড়া
নেই কি কোনো কাজও।

খালে বিলে ঘেঁটে কাদা
কী করে তুই থাকিস সাদা
পোকামাকড়ও ধরিস ঠোঁটে
কেন রে তুই এমন হাঁদা?

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

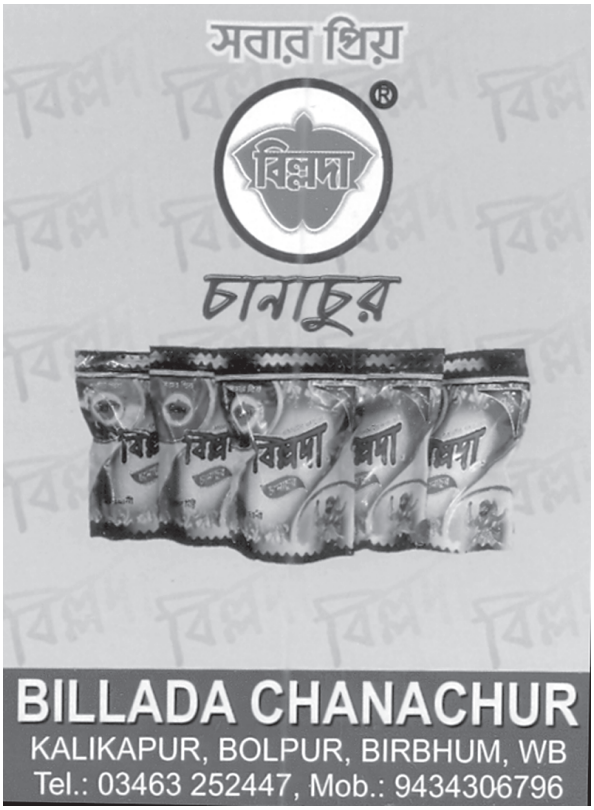

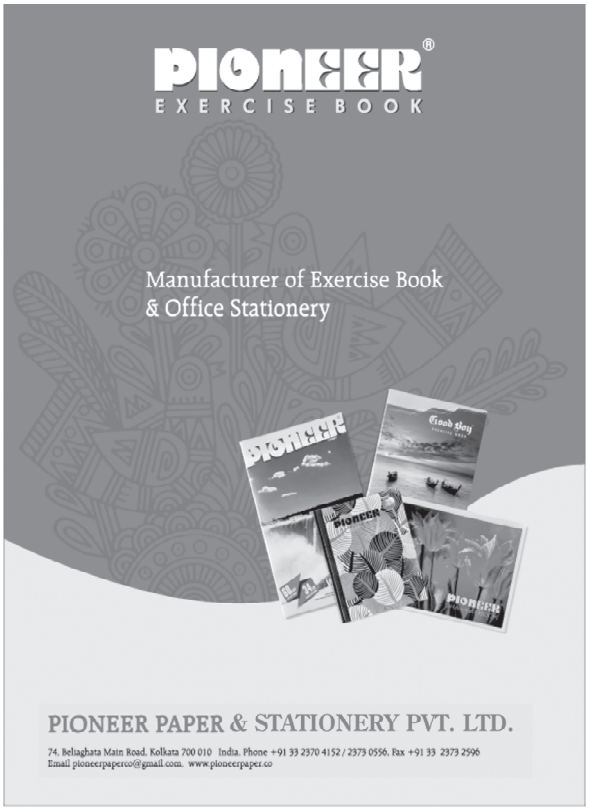

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন সর্দার উধম সিংহ

প্রণব দত্ত মজুমদার

''মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হলো বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে....''

অশ্রুজলে যেসব মহৎ প্রাণের বলিদানের কথা লেখা আছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে, তার মধ্যে উধম সিংহের নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তবে তার সঙ্গে পঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরপরাধ মানুষের যে বলিদান তাও স্মরণীয় হয়ে আছে ইতিহাসে। এইসব ঘটনা স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের জানা উচিত। তবেই স্বাধীনতার মূল্য বুঝতে পারবে তারা। ঘটনায় ব্রিটিশ ভারতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড বাড়তে থাকায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে, ইংরেজ সরকার, বিচারক স্যার সিডনি রাউলাটের নেতৃত্বে একটি কঠোর কানুনের প্রস্তাব আনে। কানুনটির নাম হলো—'The Anarchical and Revolutionary Crimes Act'। অনেকেই একে 'রাউলাট অ্যাক্ট' নামে জানে। এটি ছিল একটি কালাকানুন। এই কানুন বা আইনের বলে যে কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা যাবে এবং কোনো কারণ না দেখিয়ে বিনা বিচারে দুবছর জেলে ভরে রাখা যাবে। ১৮ মার্চ ১৯১৯ সালে Imperial Legislative Council-এ এই দমনপীড়ন মূলক কালাকানুনটি পাশ হয়ে যায়। স্বভাবতই ভারতীয় নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয়। তখন গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনি এই কালাকানুনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দিলেন।

৬ এপ্রিল গান্ধীজী হরতালের ডাক দিয়ে একদিনের উপবাস ও প্রার্থনায় বসেন। সারা

দেশে বেশ ভালোই সাড়া পড়লো, বেশ কিছু জায়গায় গোলমাল হলো, পুলিশের গুলিও চলল। ঘটনাক্রমে পঞ্জাবের অমৃতসরে এই আন্দোলন তীব্র আকার নিয়েছিল। তখন পঞ্জাবের গভর্নর ছিলেন মাইকেল-ও-ডায়ার। তিনি এই আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করার মনস্থ করলেন।

এদিকে হলো কী, অমৃতসরের দুজন প্রভাবশালী ও রাষ্ট্রবাদী ব্যবসায়ী রতনচাঁদ এবং চৌধরী বাজ্ঞা মল ৯ এপ্রিল রামনবমী উৎসব পালন করার জন্য একটি বিশাল আয়োজন করেছিলেন এবং সেখানে 'রাউলাট অ্যাক্ট' সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য দুজন বড়ো কংগ্রেস নেতা ড.সত্যপাল এবং ড. সইফুদ্দিন কিচলুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ফলে রামনবমীর ওই অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রচুর লোকের সমাবেশ হয়েছিল। কাজেই এটাকে নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে দেখালেন না লেফটেন্যান্ট গভর্নর। তিনি এটিকে 'রাউলাট অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক সমাবেশ হিসেবেই দেখলেন এবং ড.সত্যপাল ও ড. কিচলুকে গ্রেপ্তার করলেন। এই খবর ছড়িয়ে পরতেই সারা অমৃতসরে বিক্ষোভ আরম্ভ হয়ে গেল। বিক্ষোভকারীরা দলে দলে ডেপুটি কমিশনারের অফিসের দিকে যেতে লাগলো তাদের ছেড়ে দেবার জন্য আপিল জানাতে। জনতা নিরস্ত্র ছিল এবং অন্য কোনোরকম গোলমাল তখনো করেনি, শান্তিপূর্ণ ভাবেই তারা এগুচ্ছিল। একটি রেলওয়ে ক্রসিং পেরিয়ে ডেপুটি

ফঃ ৬

কমিশনারের অফিস। ওভারব্রিজ পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। ওভারব্রিজের আগেই মিলিটারি পিকেট বিক্ষভকারীদের গতিরোধ করে। তাদের সঙ্গে বচসা বেধে যায়। হইহল্লোরে মাথাগরম করে দু'একজন মিলিটারি গুলি চালিয়ে দেয়। চারজন লোকের মৃত্যু হয়। ব্যাস, জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। খবর দ্রুত ছড়িয়ে পরে। হাজার হাজার জনতা জড় হতে আরম্ভ করে। একসময় তারা মারমুখি হয়ে উঠে। পুলিশ, মিলিটারি গুলি চালাতে আরম্ভ করে দেয়। কুড়িজন লোক মারা যায়, আহত হয় বহু। বিক্ষুব্ধ জনতা আশেপাশের ব্যাংক, অফিস, মিশনারি স্কুল ইত্যাদি আক্রমণ করে। উত্তেজিত জনতার আক্রমণে তিনজন ইউরোপিয়ান ব্যাংক ম্যানেজার মারা যান, একজন মহিলা মিশনারিকে মারধোর করা হয় এবং পাঁচজন সিভিলিয়ান ইংরেজপুরুষ মারা যায়। এক কথায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

১০ ও ১১ এপ্রিল লাহোর ও জলন্ধর থেকে আরও মিলিটারি আনা হয় অমৃতসরে। ১১ এপ্রিল জলন্ধর থেকে এসে হাজির হন কড়া মেজাজের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড হ্যারি ডায়ার। তিনি শহরের দায়িত্ব নিয়ে নেন, শহরের বিভিন্ন জায়গায় মিলিটারি পিকেটিং বসিয়ে দেন। মিটিং মিছিল নিষিদ্ধ করে দেন। মিলিটারি আইন জারি করে প্রায় ২০০ লোককে গ্রেপ্তার করে মিলিটারি আইনে শাস্তি দেওয়া হলো। রতনচাঁদ ও বাজ্ঞা মলকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১২ এপ্রিল অমৃতসরের জল সরবরাহ এবং ইলেকট্রিক লাইন বন্ধ করে দেওয়া হলো। শহর শান্ত হয়ে আসে। জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়েই এসেছিল। ১৩ এপ্রিল ছিল রবিবার, হিন্দু ও শিখদের পবিত্র উৎসব বৈশাখী ছিল ওইদিন। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অমৃতসরের পবিত্র ও বিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরের খুব কাছেই বিরাট পার্ক জালিয়ানওয়ালাবাগ। স্বর্ণ মন্দিরের খুব কাছে হওয়ায় এমনিতেই ওই পার্ক সবসময় জমজমাট হয়ে থাকে। আর ওইদিন তো ছিল বৈশাখী, তাতে আবার রবিবার। অনেকেই আনন্দফুর্তি করবার জন্য বেরিয়েছেন, অনেকেই পবিত্র স্বর্ণ মন্দির দর্শনে বেরিয়েছেন। অনেক লোক ঘোরাঘুরির পর বিশ্রাম নেওয়ার জন্য পার্কে এসে বসেছেন। তাছাড়া বহু লোক পার্কে বেড়াতে, গল্পগুজব করতেও এসেছেন অন্যদিনের মতো, বাচ্চারা দলবেঁধে খেলতে এসেছে। ওইদিন পার্ক ছিল লোকে লোকারণ্য। স্থানীয় একটি অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপ অমৃতসরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি মিটিংও ডেকেছিল জালিয়ানওয়ালা-বাগে ওইদিন। বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ডায়ার সাহেব কড়া নজর রেখেছেন শহরের উপরে। ইংরেজ সরকারের তখন খুব আতঙ্ক, চারদিকে একের পর এক বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছে, ইংরেজ কর্তাদের বোমা মেরে, গুলি করে মারছে বিপ্লবীরা। এখানে উল্লেখ করা যেতে সালটা ১৯১৯, গান্ধীজীর অহিংসার মায়াজাল তখনো বিস্তারলাভ করেনি। ভারতের ভিতরে ও বাইরে বিপ্লবীদের দ্বারা ইংরেজ কর্তারা নাস্তানুবুদ হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই ইংরেজ কর্তারা খুব আতঙ্কিত থাকতেন সেইসময়। তাতে এখন আবার 'রাউলাট অ্যাক্ট' নিয়ে দেশ গরম হয়ে আছে। জেনারেল ডায়ার সাহেবের কাছে মিটিং নিয়ে হয়তো কোনো খবর ছিল। তিনি বিমান দিয়ে এরিয়াল সার্ভে করালেন শহর জুড়ে। এরিয়াল সার্ভেতে ধরা পড়ল--- জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রচুর লোকের সমাগম। ব্যাস, জেনারেল সাহেব ধরে নিলেন তার আদেশ অমান্য করে এত লোক যখন জমায়েত হয়েছে তখন নিশ্চয়ই সেটা ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে কোনো বড়োসড়ো আন্দোলনের প্রস্তুতি। মাথা গরম হয়ে গেল তার। কী এতবড় সাহস! তার আদেশ অমান্য করে এত লোকের জমায়েত করা হয়েছে? অগ্রপশ্চাৎ কোনো বিবেচনা করলেন না, ভালো করে খবর নিলেন না। তিনি তার বাহিনীর গুর্খা ও বালুচ ট্রুপকে নিয়ে বেলা ৪টে নাগাদ জালিয়ানওয়ালাবাগে পৌঁছে গেলেন। তখন বিশাল পার্ক পরিপূর্ণ। প্রায় আট থেকে দশ হাজার লোক তখন পার্কে। পার্কের এক ধারে প্রায় হাজার দুয়েক লোক শান্তিপূর্ণ ভাবেই একটি মিটিং করছিলেন। পার্কের তিন দিকই উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, শুধু একদিকেই খোলা, সেদিকেই ঢোকা বেরুনোর গেট। আর কোনো দিক দিয়েই ঢোকা বা বেরুনো যায় না। জেনারেল ডায়ার সেই গেটের ডানে গুর্খা বাহিনী ও বায়ে বালুচ বাহিনী মোতায়েন করলেন। তাদের হাতে লি-এনফিল্ড রাইফেল এবং মেশিন গান। কাউকে পার্ক খালি করার নির্দেশ না দিয়েই বিনা প্ররোচনায় অতর্কিতে কেউ কিছু বোঝার আগেই গুলি করার নির্দেশ দিয়ে দিলেন খুনি ডায়ার। নিরপরাধ মানুষের লাশ পড়তে লাগলো। মানুষের পালাবার পথ নেই। চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হয়ে গেলো। একটি মাত্র গেট, সেখানে ইংরেজের জল্লাদ বাহিনী, উঁচু উঁচু প্রাচীর বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে কেউ কেউ, পারছে না গুলি খেয়ে মরছে। পদপিষ্ট হয়ে মারা যায় অনেকে, পার্কের একটি কোনায় একটি বড়ো কুয়ো, সেখানে শত শত লোক ঝাঁপ দিয়েছে বাঁচার জন্য কিন্তু চাপে মারা গেছে। সে এক পৈশাচিক ঘটনা। বৈশাখীর পবিত্র দিনে জালিনাওয়ালাবাগের মাটি নিরপরাধ মানুষের রক্তে ভেসে গেল। সরকারি হিসেবে ৩৭৯ জন নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হয়। বেসরকারি মতে মৃত্যুর সংখ্যা হাজারেরও বেশি, আহতের সংখ্যা কয়েক হাজার। শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও ছিলেন তাতে। জালিয়ানওয়ালা -বাগের এই হত্যাকাণ্ড সারা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সারা দেশের লোক ক্ষুব্ধ। এই ঘটনায় ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এর প্রতিবাদে ইংরেজের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

আর এক অনামি তরুণের মনে চরম আঘাত লেগেছিল সেদিন। সবার অলক্ষ্যেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেদিন, এর প্রতিশোধ নেবেন। সেই তরুণের নাম শের সিংহ। সবাই তাঁকে উধম সিংহ নামেই জানে। শের সিংহের জন্ম হয়েছিল ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বরে, পঞ্জাবের তখনকার পাতিয়ালায়। তাঁর মা মারা যান তাঁর তিন বছর বয়সে এবং পিতা মারা যান তাঁর পাঁচ বছর বয়সে। পিতা-মাতা হীন অনাথ শের সিংহ মুখ্য খালসা দিওয়ানের অধীনে একটি অনাথ আবাসে লালিত পালিত হয়েছিলেন। এখানেই খালসা পন্থে দীক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর নামকরণ হয়েছিল উধম সিংহ, অনেকেই ডাকতো উধে সিংহ বলে। ১৭ বছর বয়সে

রোজগারের আশায় তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে যোগদান করেছিলেন এবং নানা জায়গায় কাজ করে আবার সেই অনাথ আশ্রমেই ফিরে আসেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের দিন তিনি অমৃতসরেই ছিলেন। জানা যায়, ঘটনার পর তিনি বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন এবং মৃতদেহ উদ্ধার, আহতদের সাহায্য করা ইত্যাদি কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনা তাঁর মনকে এতটাই নাড়া দিয়েছিল, এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে উদ্ধার কার্য সম্পন্ন হলে পরে তিনি স্বর্ণমন্দিরের লাগোয়া পবিত্র সরোবরে স্নান করবার সময় প্রতিজ্ঞা করেন এই হত্যাকাণ্ডের বদলা নেবেন।

উধম সিংহ লালা লাজপত রাইয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। ভগৎ সিংহের সংস্পর্শেও এসেছিলেন তিনি। রাষ্ট্রবাদী পত্রপত্রিকা পড়তেন। অনেক মিটিং মিছিলে যেতেন। পেটের টানে চাকরি নিতে হলো উধম তাঁকে। কার্পেন্ট্রিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, চাকরি পেলেন উগান্ডার রেলওয়ে ওয়ার্কশপে ট্রেইন্ড কার্পেন্টার হিসাবে। চলে গেলেন আফ্রিকা।

পয়সাকড়ি কিছু উপার্জন হলে পরে উধম সিংহের মনে হলো একটু ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে দেখবেন, সুতরাং বেড়িয়ে পড়লেন তিনি। মেক্সিকো, ইউনাইটেড স্টেটস, ক্যালিফোর্নিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যখন তিনি ক্যালিফোর্নিয়াতে ছিলেন সেই সময় গদর পার্টির বিপ্লবীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। এমনকী তিনি ১৯২৪ সালে গদর আন্দোলনের বড়ো নেতা মহেন্দ্রপ্রতাপের বক্তৃতাও শুনতে গেছিলেন একটি গুরুদুয়ারাতে।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। গদর আন্দোলনের বিপ্লবীদের উপর ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজর ছিল। তিনি অমৃতসরে পৌঁছুবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গদর পার্টির সঙ্গে উধম সিংহের যোগাযোগ আছে সন্দেহে ইংরেজের পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তাঁর কাছে দুটি রিভলবার এবং একটি অটোমোটিক পিস্তল পায়। তিনি যেগুলো ইউনাইটেড স্টেট্‌সে থাকার সময় কিনেছিলেন, কিন্তু ভারতে ব্যবহার করার লাইসেন্স ছিল না। তাঁর পাঁচবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হলো। কারাগারে তিনি নাম নথিভুক্ত করেছিলেন শের সিংহ নামে। জেলে থাকতেই তিনি ১৯৩১ সালে ভগত সিংহের ফাঁসির খবর পান। তাঁর পুরানো প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে যায়, মন উতলা হয়ে উঠে তাঁর, বদলা নেওয়ার প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়তর হয়। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ছাড়া পান তিনি।

জেল থেকে বেরিয়ে প্রতিজ্ঞা পূরণে সচেষ্ট হন উধম সিংহ; কিন্তু প্রতিজ্ঞা পূরণ করবেন কী করে? খোঁজ নিয়ে দেখলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের দুই খলনায়কই নিজেদের দেশ ইংল্যান্ডে চলে গেছে। তিনি ঠিক করলেন তাদের ইংল্যান্ডে গিয়েই হত্যা করবেন তিনি। প্রতিজ্ঞার কোনো নড়চড় হবে না। জেলের নথিতে শের সিংহ নাম ছিল, তিনি উধম সিংহ নামে ইউরোপে যাওয়ার পাসপোর্ট বানালেন, কেউ ধরতে পারল না। ইউরোপের উদ্দেশে রওনা দিলেন তিনি। জীবিকার জন্য নানারকম কাজকর্ম করতে করতে ঘুরতে ঘুরতে খবর নিতে নিতে অবশেষে ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি লন্ডনে গিয়ে পৌঁছুলেন। এবার আসল কাজ।

তিনি শেফার্ড ,এ ৭৯, শিনক্লেয়ার রোডে অবস্থিত গুরুদুয়ারাতে যাতায়াত আরম্ভ করলেন খবরাখবরের জন্য এবং জানতে পারলেন জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন যিনি সেই বিগ্রেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ার কয়েক বছর আগেই মারা গেছেন; কিন্তু আর এক খলনায়ক তখনকার পাঞ্জাবের গভর্নর জেনারেল মাইকেল ও' ডায়ারের খবর পেলেন। তিনি মনস্থ করলেন তাকেই হত্যা করবেন, তিনিও সমান দোষে দোষী। খবর পেলেন, রয়্যাল সেন্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি, ১৩ মার্চ ১৯৪০ তারিখে Caxton Hall-এ একটি সেমিনারের আয়োজন করেছে। সেখানে বক্তব্য রাখবেন Sir Michael O' Dyer। এই সেই বিখ্যাত Caxton Hall সেখানে তিন দশক আগে মদনলাল ধিংড়ার বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাব আনা হয়েছিল যখন তিনি নিষ্ঠুর ব্রিটিশ কর্তা কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করেছিলেন। এই হলেই সেই নিন্দা প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করতে গিয়ে মার খেয়েছিলেন বীর সাভারকার।

বিকেল তিনটের সময় মিটিং শুরু হলো। প্রায় ৪০০ লোকের জমায়েত হয়েছে। সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত আছেন ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্রেটারি অফ স্টেট্‌স জেটল্যানজ সাহেব। এছাড়া উপস্থিত আছেন প্রমুখ কর্তা ব্যক্তিরা। যথা সময়ে কোট প্যান্ট লাল টাই পরিহিত অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বেশে লোডেড পিস্তল নিয়ে সভায় ঢুকলেন উধম সিংহ। কেউ কোনো সন্দেহই করল না। শুধু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা। বক্তারা সবাই যে যার বক্তব্য রাখলেন। সেমিনার শেষ হলো। উপস্থিত সবাই আসন ছেড়ে উঠছেন। এগিয়ে গেলেন উধম সিংহ, মাইকেল ও' ডায়ারকে লক্ষ্য করে দু'রাউন্ড গুলি ছুড়লেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হলো। জেটল্যান্ড সাহেবকে লক্ষ্য করেও দু' রাউন্ড গুলি ছুঁড়েছিলেন উধম সিংহ, মোট ছ'রাউন্ড গুলি তিনি ছুঁড়েছিলেন। Sir Louis Dane এবং Lord Lamington আহত হলেন। আরও গুলি পকেটে ছিল কিন্তু বার করার সময় পাননি। সভার লোকেরা তাঁকে জাপটে ধরে ফেলে। পুলিশ এসে তাঁকে হাতকড়া পড়িয়ে নিয়ে যায়। জানা যায় সেই সময় উধম সিংহ মৃদু মৃদু হাসছিলেন, মুখমণ্ডলে ছিল প্রসন্নতার ছাপ, প্রতিজ্ঞা পূরণের তৃপ্তি। ২০ বছর পরে হলেও তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছেন।

উধম সিংহকে প্রথমে ব্রিক্সটন জেলে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় পেনটনভিল জেলে। সেখানেই ১৯৪০ সালের ৩০ জুলাই উধম সিংহের ফাঁসি হয়। তিন দশক আগে এই একই ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বলিদান দিয়েছিলেন মদনলাল ধিংড়া— অমৃতসরের আর এক বীর সন্তান। ১৯৪৭ সালে উধম সিংহের অস্থি সেখানে নিয়ে আসা হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের মিউজিয়ামে তাঁর অস্থিকলস সসম্মানে রক্ষিত আছে। □

সশস্ত্র বিপ্লবের অবিচল সেনানী
বিপ্লবী রাসবিহারী বসু

রাজদীপ মিশ্র

জাপানে প্রতিদিন শোবার জন্য দক্ষিণ দিকে মাথা দিয়ে ঘুমোতে দেখে এক বন্ধু বলে, বেহারি (এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন), তুমি দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে ঘুমাও, সেটা ঠিক নয়। ভারাক্রান্ত স্বরে সেই ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'তুমি রুষ্ট হয়ো না। আমি সারদিনের শেষে ওইদিকে ভারতমায়ের কোলে মাথা রেখে নিজেকে প্রাণবন্ত করি।' এই দেশপ্রেমিক ছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। তিনি বলতেন— 'বিপ্লবীদের মন এতটাই নিয়ন্ত্রিত হবে যে, ডান হাত কী করছে, বাঁ হাত তা জানবে না।'

রাসবিহারী বসু ছিলেন বিনোদবিহারী বসু ও ভুবনেশ্বরী দেবীর সন্তান। পূর্ববর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে চলে লাঠিখেলা শিক্ষাও। শিক্ষকদের কাছ থেকে শোনা বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী গল্প ছিল তাঁর পরবর্তীকালের বিপ্লবী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা। স্কুলের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের বদলে দেশপ্রেমের কথা বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের কথা আছে এমনসব বই পড়ার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ', নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' তাঁর মনকে নাড়া দিত। স্বামী বিবেকানন্দ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক লেখাগুলিও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। রাসবিহারী বসু-সহ চন্দননগরের বহু তরুণ বিপ্লবী নিরালম্ব স্বামীর দ্বারা প্রচারিত সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠে। নিরালম্ব স্বামী (যাঁর সংসার জীবনের নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। একই সময়ে রাসবিহারী চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে আসেন। অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায় চন্দননগরে বিপ্লবী চিন্তাধারার পথিকৃৎ ছিলেন।

চারুচন্দ্র তাঁর বাসভবনে 'সুহৃদ সম্মিলনী' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। লাঠি খেলা, ছোরাখেলা, শারীরিক ব্যায়ামচর্চা, ইতিহাস ও বিপ্লবমূলক বইপত্র পাঠ, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি ছাত্র ও যুবকদের দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করতেন। তাঁর সমস্ত শিষ্য ছিল কানাইলাল দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষের মতো বিপ্লবীরা। অধ্যাপক রায়ের বাড়িতে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কার প্রমুখ বিপ্লবীর যাতায়াত ছিল। রাসবিহারী বসু 'সুহৃদ সম্মিলনী'তে যোগ দিয়ে জীবনের এক নতুন দিশা পান।

কলেজস্তরের পড়াশোনার নিয়মমাফিক সমাপ্তি ঘটার আগেই রাসবিহারী বসুর জীবনধারা অন্যদিকে বাঁক নেয়। কলেজে পড়াশোনার বদলে অন্যদিকে মনোযোগ আর অস্থিরচিত্ততা লক্ষ্য করে চন্দননগরে তার বাবার এক আত্মীয় তাকে ফোর্ট উইলিয়ামে কেরানি হিসেবে ঢুকিয়ে দেন। এরপর সেই আত্মীয়ের বাবার অনুরোধে তাকে সিমলার সরকারি ছাপাখানায় তাকে বদলি করা হয়। পরবর্তীকালে বিখ্যাত দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগ দেন তিনি।

দেরাদুনে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় যুগান্তরের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁরই হাত ধরে বাঘাযতীনের নেতৃত্বাধীন এক বিপ্লবী গোষ্ঠীর কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। যোগাযোগ হলো আর্যসমাজের বিপ্লবী সদস্যদের সঙ্গে, যাঁদের কাজের জায়গা ছিল উত্তরপ্রদেশ ও পঞ্জাব। কাজেই কর্মসূত্রে দেরাদুনে থাকলেও বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জাল তিনি বাঙ্গলা, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশে বিস্তার করেছিলেন। রাসায়নিক ব্যবহার ও প্রয়োগের প্রতি তাঁর এত আগ্রহ ছিল যে, তিনি 'ক্রুড' বোমা তৈরি করা শিখেছিলেন।

১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর। ভারতবর্ষের রাজধানী স্থানান্তরিত হচ্ছে কলকাতা থেকে দিল্লিতে। ভাইসরয়

হার্ডিঞ্জকে স্বাগত জানাতে তৈরি দিল্লি। রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনায় ও নির্দেশে চাঁদনিচকের এক বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া, একহারা চেহারার মহিলার বেশে ১৬ বছরের বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও ভাইসরয় জখম হয়। বিস্ফোরণের পরদিনই দেরাদুনে ফিরে এসে রাসবিহারী স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে থাকেন। গদর আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

দেরাদুনে থাকলেও ছদ্মবেশে বিভিন্ন কাজে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর ছিল অবাধ যাতায়াত। যখন তার মাথার দাম ওঠে এক লক্ষ টাকা, সেসময় পুলিশের চিফ কমিশনারের ঠিক উলটোদিকে বসে ছদ্মবেশে তিনি ট্রেনে সফর করেছিলেন। ছদ্মবেশেই ১৯১৩ সালে বন্যাবিধ্বস্ত সুবলদহে আসেন ত্রাণ বিলির জন্য। বৈপ্লবিক কাজের জন্য এতবেশি ছদ্মবেশ ধারণ করতে হতো যে বিপ্লবীরাও তাকে চিনতে পারতেন না। ভারতের সেনাবাহিনীতে বিপ্লবীদের প্রবেশ করিয়ে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতব্যাপী একটি বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা ব্যর্থ হয়।

বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এবং আরও অন্যান্য অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের জন্য হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। ১৯১৫ সালে ১২ মে কলকাতার খিদিরপুর বন্দর থেকে জাপানি জাহাজ 'সানুকি-মারু'তে করে নিজেই পাসপোর্ট অফিস থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় রাজা প্রিয়নাথ ঠাকুর ছদ্মনামে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

তাঁর অসাধারণ কূটনৈতিক বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা জাপানি নেতৃবৃন্দের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। জাপানি ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশ্বাস ও রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। এটা ছিল ভিন্ন দুটি দেশ, দুটি জাতি ও সংস্কৃতির সমন্বয় রক্ষার্থে অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ, যাতে তিনি সফল হয়েছিলেন। জাপানে তিনি খুঁজে পেলেন বিভিন্ন এশীয় গ্রুপের ছত্রছায়া। ব্রিটিশরা রাসবিহারীর প্রত্যার্পণের ব্যাপারে জাপান সরকারকে চাপ দিতে থাকে। ১৯২৩ সালে তিনি জাপানের নাগরিক হন। সেখানে তিনি সাংবাদিক তথা লেখক হিসেবে বাস করতে থাকেন। ওই বছরই ২৭ নভেম্বর টোকিয়োতে লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে তিনি সভা করলেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে খবর গেল। এরপর ব্রিটিশ সরকারের চাপে জাপান মারফত জারি হলো নির্বাসনের আদেশ। তাঁরই তৎপরতায় জাপানি কর্তৃপক্ষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের পাশে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন জোগায়।

১৯৪২ সালের ২৮-২৯ মার্চ টেকিয়োতে তাঁর ডাকে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ বা ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি সেই সম্মেলনে একটি সেনাবাহিনী গঠনের প্রস্তাব দেন। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ নামক বৈপ্লবিক সংগঠনটি পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে ওঠে।

১৯৪২ সালের ২২ জুন ব্যাংককে তিনি লিগের দ্বিতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বসুকে লিগে যোগদান এবং লিগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্ব ও পরিস্থিতি বুঝে ১৯৪০ সালে 'আজকের অবিসংবাদিত নেতা' হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম ঘোষণা করেছিলেন রাসবিহারী বসু।

১৯৪২ সালে রাসবিহারী বসু পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তৈরি করেন আজাদ হিন্দ ফৌজ (Indian National Army)। এই সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল জাপানের সহায়তায় ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ। এই বাহিনী মূলত গঠিত হয় জাপানের হাতে ধরাপড়া ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে। এরা মালয় অভিযান ও সিঙ্গাপুরের যুদ্ধের সময় জাপানের হাতে ধরা পড়েছিল। এছাড়াও মালয় ও ব্রহ্মদেশের ভারতীয় প্রবাসীদের একটি বিরাট অংশ এই বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি এই আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে অর্পণ করেন।

জাপান সরকার তাঁকে সেখানকার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'Order of the Rising Sun' দ্বারা ভূষিত করেন। রাসবিহারী ছিলেন একনিষ্ঠ হিন্দু, নিঃস্বার্থ ও স্বদেশপ্রেমে তেজস্বী একজন মানুষ। নিয়ম ও সময়জ্ঞান ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রখর। তাঁর প্রবল আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ তাঁকে আজীবন সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি অবিচল থাকতে সাহস জুগিয়েছিল।

প্রিয়তম কবি Robert Browning এর 'Prospice' কবিতার দুটি লাইন তাঁর খুব প্রিয় ছিল—

'I was ever a fighter.
So– one fight more.
The best and the last!'

এই পঙ্‌ক্তিগুলি মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জীবনে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

সুপ্রিম কোর্টে ৩৭০ সংক্রান্ত শুনানি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদটি বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীরের স্পেশাল স্ট্যাটাসের অবলুপ্তি ঘটায়। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে একগুচ্ছ পিটিশন দায়ের হয়। ২ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে সুপ্রিম কোর্টে শুরু হয় সেই মামলার নিয়মিত শুনানি। প্রথম দিন শুনানির পর যে মূল প্রশ্নগুলি উঠে আসে তা হলো ৩৭০ অনুচ্ছেদটিকে 'অস্থায়ী' বলে সংবিধানে স্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও তা আদৌ 'স্থায়িত্ব' লাভ করেছে কী না, 'স্থায়িত্ব' লাভ করে থাকলে তা কীভাবে এই অনুচ্ছেদটি বাতিলযোগ্য নয় তা বলার কী কারণ থাকতে পারে। বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কউল, সঞ্জীব খান্না, বি আর গাভাই, সূর্যকান্ত-সহ প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ৫ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এই শুনানিতে আবেদনকারী ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা মহম্মদ আকবর লোনের আইনজীবী কপিল সিবালের উদ্দেশে এই প্রশ্ন করেন। শুনানিতে অংশ নিয়ে ইতিহাসের পাতা থেকে ১৮৪৬ সালের লাহোর চুক্তির উল্লেখ করে কপিল সিবাল বলেন যে কাশ্মীর তার স্বাধীন সত্তা ধরে রাখতে চাইলেও ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের মদতে সশস্ত্র, বহিরাগত আগ্রাসনের দরুন কাশ্মীরের মহারাজ 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ্ অ্যাকসেশন' বা ভারতভুক্তির চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হন। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য রাজ্যসমূহের ভারতভুক্তির সঙ্গে কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পার্থক্যের উল্লেখ করে তিনি জানান যে অন্য রাজ্য সমূহ স্বাধীনতা লাভের আগেই ভারতে যোগদান করে। কিন্তু অন্য রাজ্যগুলির মতো কাশ্মীরের মহারাজ দ্বিতীয়বার কোনো সংশোধিত চুক্তি সই করে রাজ্য প্রশাসনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তান্তর করেননি, সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রিন্সলি স্টেটস্ বা রাজতান্ত্রিক দেশীয় রাজ্যগুলির থেকে জম্মু-কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ঐতিহাসিক ও সাংবিধানিক প্রেক্ষাপট পৃথক বলে সিবাল দাবি করেন। ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময়ে জম্মু-কাশ্মীরের সংবিধান সভা

গঠিত না হওয়ার কারণে ৩৭০ নং অনুচ্ছেদকে 'অস্থায়ী' আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯৫১ সালে জম্মু-কাশ্মীরের সংবিধান সভা গঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান রচনার পরে যার পরিসমাপ্তি ঘটে। জম্মু-কাশ্মীরের এই সংবিধান স্পেশাল স্ট্যাটাস বা বিশেষ মর্যাদা সহ রাজ্যের ভারতভুক্তিকে মান্যতা দেয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের পার্লামেন্টের মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীরের জনতার মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়ে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নং অনুচ্ছেদকে নিষ্প্রভাবী করতে পারে না বলে কপিল সিবাল দাবি করেন। তিনি বলেন যে, এই কাজ সাংবিধানিক ভাবে সম্ভব নয়। ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ বাতিলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনসভার (জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা) অনুমোদন না নিয়ে রাজ্যটিকে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে তিনি বিবেচনাহীন, আইন-বহির্ভূত ও নজিরবিহীন বলে উল্লেখ করেন।

সিবালের যুক্তি শুনে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন যে ১৯৫৭ সালে রাজ্যের সংবিধান সভার পরিসমাপ্তির পর তাহলে অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর পরিণতি কী? ৩৭০ নং অনুচ্ছেদের অধীন ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর আদেশবলে অনুচ্ছেদ ৩৭০-কে নিষ্প্রভাবী ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু তাঁর এই ঘোষণা রাজ্য সংবিধান সভার অনুমোদন সাপেক্ষ। সেই সংবিধান সভা বর্তমানে অস্তিত্বহীন হওয়ার কারণে এই 'অস্থায়ী' ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ কি বাতিল ঘোষণা সম্ভব নয়? সংবিধান সভার অস্তিত্বহীনতার দরুন ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ কি স্থায়ী চরিত্র পরিগ্রহ করেছে? বিচারপতি কউল প্রশ্ন তোলেন যদি জম্মু-কাশ্মীরবাসী ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ বাতিলের পক্ষে মতপ্রকাশ করে, তবে কি বর্তমানে রাজ্য সংবিধান সভার অস্তিত্ব বিলোপের কারণে তার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়? প্রধান বিচারপতি বলেন যে ১৯৪৭ সালে জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তির চুক্তির মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য তৎকালীন ডমিনিয়ন ভারতের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করেছে এবং এই স্বীকৃতি অসম্পূর্ণ বা কোনো সীমিত উদ্দেশে বলে কোথাও ব্যক্ত হয়নি। রাজ্য আইনসভার এক্তিয়ারভুক্ত কিছু সংরক্ষিত বিষয় ছাড়া জম্মু-কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি ও ভারতীয় সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি একটি 'সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া'। জবাবে কপিল সিবাল বলেন, ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জম্মু-কাশ্মীর সংবিধান সভার ওপর ন্যস্ত থাকার দরুন সংবিধানে এই অনুচ্ছেদকে অস্থায়ী আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু সংবিধান সভা এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। এই সংবিধান সভার অস্তিত্ববিলোপের কারণে ৩৭০ অনুচ্ছেদকে নিষ্প্রভাবী ঘোষণার ক্ষমতা বা অধিকারের অস্তিত্ব নেই। প্রধান বিচারপতি পালটা প্রশ্ন করেন যে একটি স্বাধীন রাজ্য নিঃশর্তভাবে একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে সেই রাষ্ট্রভুক্তির অঙ্গীকার করলে, যোগদানের প্রাথমিক চুক্তি অনুযায়ী কি বলা যায় যে সংশ্লিষ্ট দেশের সংসদ বা পার্লামেন্ট সেই রাজ্য সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের অধিকারী নয়? এছাড়াও, অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর অন্তর্গত একাধিক ধারা ও উপধারা তুলে ধরে তিনি বলেন যে সম্মতি ও পরামর্শের জন্য উল্লেখিত সাংবিধানিক বিষয় সমূহ কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ তালিকাভুক্ত। তাই এই ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ধারাসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে অবাধ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭ ও ২০১৯ সালের সংশোধনীর দ্বারা যথাক্রমে জম্মু-কাশ্মীরকে জিএসটি কর ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ও ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ বিলোপের ঘোষণা হয়।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩০

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

ড. জয়ন্ত কুশারী

উপন্যাস

প্রবাল, এষা দে, শেখর সেনগুপ্ত

জীবনী

বিজয় আঢ্য, নারায়ণ চক্রবর্তী

পুরাণ কথা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গল্প

সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী, অনির্বাণ দে, দেবদাস কুণ্ডু, সমাজ বসু, জয়ন্ত পাল।

প্রবন্ধ

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত রায়, রবীন্দ্র জোশী, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, গোপাল চক্রবর্তী

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৫৬।।

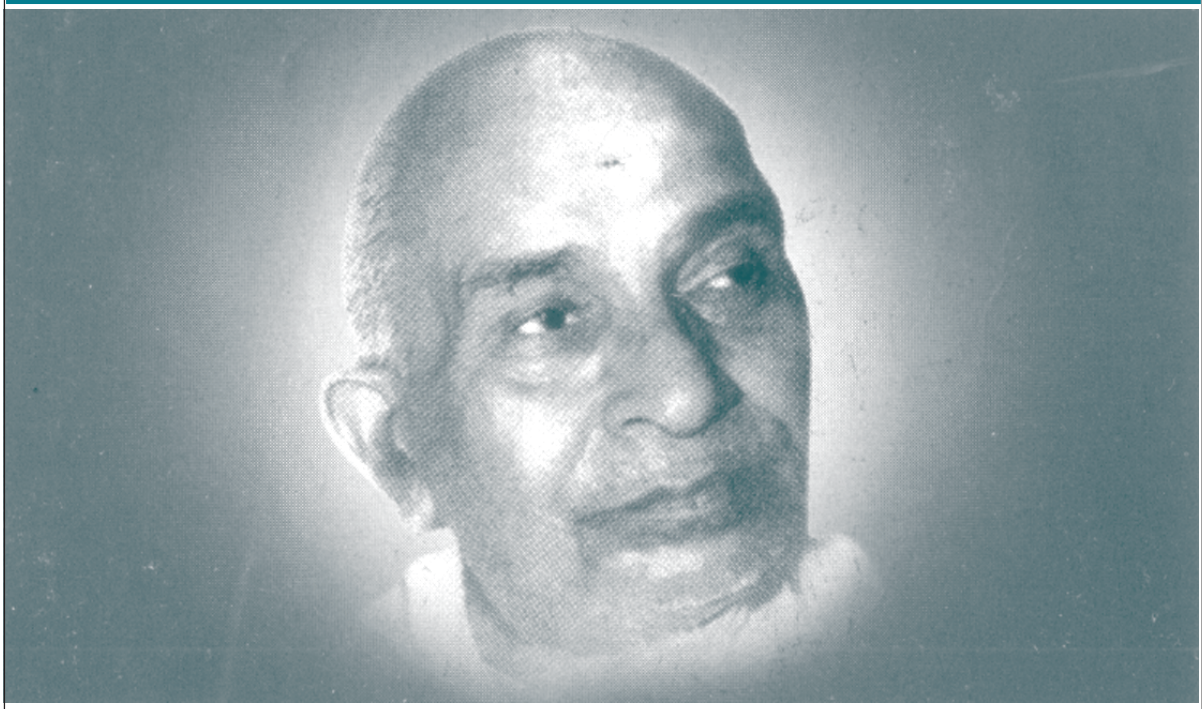

১৯৮৬ সালের ২ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল কলকাতায় দেশ দেশান্তরের সাধু, গুণীজনেরা সমবেত হন। মহানামব্রতজীর কর্মকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে দেওয়া হলো নাগরিক সংবর্ধনা।

শতবর্ষ আগে কলকাতার ডোমপল্লীতে এসে বাস করেছিলেন প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। তাদের উন্নতির কথা ভেবেছিলেন তিনি। তাই কর্মীবন্ধুরা দল বেঁধে একটি মন্দির গড়লেন। ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে মন্দিরের উদ্বোধন করলেন মহানামব্রতজী নিজে। নাম হলো শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু লীলাঙ্গন।

(সমাপ্ত)